কার্ণিভ্যাল

এক টাকা

কার্ণিভ্যাল

ফাল্গুনী রায়
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

—রূপকথা পাবলিশিং—
১০৫, রসা রোড, (সাদার্ণ এভিনিউ) কলিকাতা

রূপকথা পাবলিশিং
হইতে
অশ্বিনীকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৪৭

বিজলী প্রেস—
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১০৫ রসা রোড, (সাদার্ণ এভিনিউ) কলিকাতা

উৎসর্গ

রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদারকে

ফাল্গুনী রায়

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন, ১৩৪৭

আয়না

(উৎসর্গ—প্রেমেন্দ্র মিত্রকে)

ফাল্গুনী রায়

রাত—১০টা

সোমবার,

২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৭

আয়না

দক্ষিণের হাওয়ার এক ঝলক ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধ হরলালবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন, চোখ দু'টি মুছে নিলেন ভালো করে।

ক্যালেণ্ডারের পানে চোখ পড়ে—পয়লা ফাল্গুন, বসন্তের প্রথম দিন! শুধু ক্যালেণ্ডারেই বসন্ত আসেনি, এসেছে তার জীর্ণ শীর্ণ জরা-জর্জর শরীরে মনে। অঙ্গে অঙ্গে কিসের একটা ঢেউ খেলে গেল, সুপক্ক রূপালী চুলগুলো উড়তে লাগলো, আবেশে অবশ হয়ে আসছে চোখ।

তার মনে হঠাৎ হুড়মুড় করে ভিড় করে এলো সেই বহু-পিছনে-ফেলে-আসা পঁচিশ বছরের দিনগুলো। সে ভীড়ের গভীরে তিনি যেন হারিয়ে গেলেন, তিনি যেন তার সত্বা নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তার পঙ্গুত্ব—তার জর্জরতা নিমেষে যেন কোথায় ভেসে গেল। হঠাৎ এলো যেন তার মাঝে পঁচিশ বছরের সেই উদ্দাম তারুণ্য, সেই দীর্ঘ দীপ্ত ঘোড়-সওয়োরের মত সুঠাম দেহ, ঋজু বার্দ্ধক্যের শৃঙ্খল-মুক্ত, সেই প্রথম প্রেমের উত্তাল উল্লাস, সেই মত্ত মদিরতা—অন্ততঃ তিনি তা অনুভব করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে এলো একটি সুশান্ত, সুমধুর ডাক: চামেলী,

চামেলী···যেন সেই পঁচিশ বছরের অতীতের তীর থেকে যেন কত বছরের কবরের অন্ধকার মাড়িয়ে···কী আশ্চর্য !

হরলাল বাবু এবার সত্যিই বিছানা ছেড়ে উঠলেন। চাকর হাঁকেন ঃ এই নীলে, নীলে,। তিনি নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন—এই তো আগের সেই . মেঘ-মন্দ্রস্বর—সুগভীর। চাকর কাঁপতে কাঁপতে এলোঃ আজ্ঞে ডাকছিলেন ?

—হ্যাঁ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

গভীর গর্জ্জন !

—এঁ্যা,

ভয়-কম্পিত কণ্ঠ !

এঁ্যা, কী ? কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? পাজী, হতভাগা কোথাকার ! শোন, আমার জুতোটা ভাল করে বুরুশ করে দে—একবার বেরুব।

—আজ্ঞে, সরকার মশাই তো এখনো কোলকাতায় ফেরেন নি, কার সঙ্গে আপনি···

ভয়ে সব কথা শেষ করতে পারল না।

—কারো সঙ্গে নয়, আমি একলা বেরুব—যা তাড়াতাড়ি কর্ গিয়ে !

—কারো সঙ্গে বেরোলে, আজ্ঞে আপনি বুড়ো মানুষ, পথে যদি···

ভাঙা-চোরা কথাগুলো !

—আবার তর্ক, বুড়ো মানুষ !

বুড়ো মানুষ, বুড়ো মানুষ ! চাকরের কণ্ঠ যেন আর এক দক্ষিণের হাওয়ার ঝলকে মিশে গেল, শোনা গেল না।

চাকর বললে : হুজুর লাঠি ?

—লাঠি দিয়ে কী হবে ? ও হ্যাঁ। দে সেই বাহারী হাড়ের লাঠিটা।

লাঠি নিলেন সেটা অবলম্বন বলে নয় বিলাস হিসেবে, পথে যেতে যেতে ঘোরাবেন বলে, অন্যমনস্ক হ'য়ে।

সিল্কের পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর আর পকেটে নিলেন একটি সিল্কের রুমাল। এই বেশে একবার তিনি বারাণ্ডায় দাঁড়ালেন। বিকেলের ফিকে নীলাভ আকাশ, দক্ষিণের হাওয়া বইছে। বৃদ্ধ হরলালবাবু আপন মনেই বলছেন, চামেলী, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে, চামেলী, my darling ! তাঁর চামেলীর মুখখানি মনে পড়লো—ভোরের দিগন্ত লেখার মত বাঁকা চোখের পল্লব, ধনুকের মতন ভ্রূ, প্রদীপের মত স্বপ্নিল আয়ত চোখ ! কী চমৎকার, চামেলী, How magnificient you are !

বৃদ্ধ হরলালবাবুর উচ্ছ্বাস মানা মানে না। তার চলনে চাপল্য, তার বলনে যেন সেই যৌবনের উচ্ছলতা।

বৃদ্ধ হরলালবাবু বাড়ী থেকে বেরুলেন। ঠিক মনে আছে? হ্যাঁ ঠিকই মনে আছে। একি আর ভুলবার? সে ঠিকানা আর কী ভুলবার? একদিনো যেখানে যাওয়া বাদ যায় নি আর আজ তার ঠিকানা ভুলে যাবে? কী যা তা ভাবেন? দক্ষিণের হাওয়া বাস্তবিকই বড় গোলমাল করে মন এমন মাতাল করে' সব ভুলিয়ে দেয়!

কলিংবেল টিপতেই বেরিয়ে এলো একটি সুন্দরী মেয়ে। দেহে তার বেগুনী শাড়ী, আয়ত চোখে স্বপ্নময়তা, ধনুকের মত ভ্রূ! তিনি চমকে উঠলেন: চামেলী, কতদিন পরে! আমার যা আনন্দ হচ্ছে! Lyrical as before, সত্যি একটুও বদলাওনি!

আপনি ভুল করছেন— আমার নাম রিনি, আমার মার নাম, চামেলী, তাঁকে ডেকে দেব?

রিনির কণ্ঠ যেন গানের মত রিন্-রিন্ করলো।

—ওঃ তুমি চামেলী নও, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম···

হরলালবাবু যেন পঁচিশ বছরের হরলাল! কণ্ঠস্বরের গভীরতা, সুললিত।

—আচ্ছা তাকে ডেকে দাও, বলো হরলালদা এসেছেন!

রিনি ভিতরে গেল। বৃদ্ধ হরলালবাবু ভাবছেন—তাঁর

চামেলী এখনি আসবে, সেই চামেলী, এখনো ঠিক সে রকমই আছে নিশ্চয়—সেই Lyrical, একটু বদলায় নি !

শ্রীমতী চামেলী দেবী এলেন। পড়নে একটি সাদা শাড়ী আড়ম্বরহীন। মুখে বার্দ্ধক্যের আঁচর, দেহে বাঁক ধরেছে, চোখ দুটি দীপ্তিহীন ঘোলা, চোখ কোটরের অতলে চলে গেছে—ভ্রূ সাদা হয়ে এসেছে, কালিতে ঢাকা। বৃদ্ধ হরলালবাবু আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন : তুমি চামেলী অসম্ভব, আমার সেই চামেলী, সেই lady of my heart !

—ইস কি যা'তা বলছেন, মেয়ে সামনে !

রিনি অপ্রস্তুত হ'য়ে চলে গেল। হরলালবাবু বললেন : No that can't be-that can't be, this is the Ghost of Chameli, Ghost of Chameli !

চামেলী দেবী বললেন— বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি চামেলী আর চেহারা এ রকম হ'বে না—বয়স কত হ'লো জানেন ? তিন কুড়ি পার হ'য়ে গেছে !

—কি যা'তা বলো, বয়েস কিছুই হয় নি, বয়েস কিছুই হয় নি।

My goodness, এই আমার সেই চামেলী ! আমি এখনো ঠিক করতে পারছি না, where am I ? Am I in good order ? না, না, তুমি চামেলী নও, তুমি চামেলী নও, চামেলী

নিশ্চয়ই ভিতরে আছে, She is playing a funny game with me, তাকে ডেকে দাও !

—কী মুস্কিল আপনার কী মাথা খারাপ হ'য়েছে, না বুড়ো বয়েসে, ভীমরতি ধরেছে !

—বুড়ো বয়েস, বুড়ো বয়েস আমি কী বুড়ো নাকি ? তোমারই মাথা খারাপ হ'য়েছে, In what sense am I old ? I am a full-blooded youngman of 25, the most handsome youngman.

বৃদ্ধ হরলালবাবু যথাসম্ভব সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। তার হাত দুটিতে যেন ঝরনার প্রাণ-স্পন্দন, রক্তে উতরোল নদীর কলরোল !

হরলালবাবু আবাব বললেন : যাও তাকে ডেকে দাও।

—আমিই চামেলী কী করে বিশ্বাস করাব, এই দেখুন চোখের ভিতর সেই তিলি !

এঁ্যা, এই তো সেই তিল ! তুমি চামেলী, তুমি চামেলী, wonderous ! কিন্তু চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গেল কেন ? অসুখ করেছিল !

চামেলী দেবী এবার ক্লান্ত-ক্লিষ্ট-কণ্ঠে বল্লেন : অসুখ ! কবেই বা সুখের মুখ দেখলুম—এক এক করে তো সবই গেল ছেলেটা গেল, উনি গেলেন !

তাই নাকি ? ও তাই এত শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে ! যাক দুঃখ করেই বা কী হ'বে ? Let us enjoy this evening, দুঃখ তো আছেই বরাবর, সুখ যতটুকু পাই উপভোগ করেনি··· চলো আমাদের সেই Grove roomএ সেই নরম নীড়ের মত শান্ত শ্যামল ঘরে—চলো ছড়িয়ে দেব সেখানে তন্দ্রার তুষার। We will scatter snow of slumber, উপরে নীল বালব, চলো কতদিন পরে, কতদিন পরে ! বৃদ্ধ হরলালবাবু উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন।

—কী ছেলে মানুষি করছেন, বুড়ো বয়েসে—

আবার সেই বুড়ো বয়েস। চামেলী আমি কী করে বোঝাব তোমায় আমি বুড়ো নই ! চামেলী এই দেখ এই লাঠি আমি দূরে ছুঁড়ে ফেল্লাম—এই দেখ আমি ছুটছি—এই দেখ দুমুঠোর জোড়, এই দেখ এই শরীরে কী অসীম ক্ষমতা !

ব'লে তিনি মুঠো জোর করে ধরলেন, বাস্তবিক ছুটতে আরম্ভ করলেন, লাঠি প্রচণ্ড বিক্রমে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

—দেখলে চামেলী, দেখলে !

—কী করছেন ? বুড়ো বয়েসে অত সয় ?

—আবার—আবার-চামেলী, stop that silly syllable, বুড়ো বয়েস, বুড়ো বয়েস······তারপর স্বর প্রশান্তে নামিয়ে

চামেলীর শিরবার-করা শীর্ণ হাত দু'টি ধরে আবেগ-ময় সুরে বল্লেন : চামেলী, চলো ; আমাদের সেই Grove roomএ চলো ! আজ কী সুন্দর delicious evening, দক্ষিণের হাওয়া কী সুন্দর চলো, চামেলী চলো !

—কী যে করছেন তখন থেকে, বুড়ো বয়েসে অত ভালো-লাগে ও সব ?

এবার হরলালবাবু ভীষণ ক্ষেপে উঠলেন। তাঁর রগ দু'টি ফুলে উঠলো, কণ্ঠ এবার হিমালয়ে : দেখ this is the last chance, বুড়ো বুড়ো বলো না, I will create a serious havoc, বুড়ো, বুড়ো, কেবল বুড়ো বুড়ো !

চামেলী দেবী রেগে উঠলেন, বল্লেন : বুড়ো নয়তো কী ? থুপ থুপে বুড়ো, ৮০বছরের বুড়ো, আয়নায় একবার মুখ খানা দেখুন না—ওই তো সামনেই রয়েছে !

—আয়না, আবার আয়না দেখে কী হবে ? এই beautiful face এ আবার আয়না দেখতে—হয় নাকি ? The most glamourous creature that you have ever seen, the most handsome young man.

তিনি আবার সেই কথাই বল্লেন।

চামেলী দেবী ব্যাঙ্গ করে উত্তর দেন : ওঃ খুব হয়েছে, young man ! থুর থুরে বুড়ো ! দেখুন না আয়না ওই তো রয়েছে !

তিনিও আবার পুনরুক্তি করলেন।

—কই দেখি ?

—ওই তো !

হরলালবাবু মুখটা ভালো করে মুছে নিয়ে দেখলেন। যেন বজ্রাহত হলেন—এ রকম ভাব। আয়নায় মুখ দেখছেন—যেন মহাকালের আয়নায়—ইস্ ইস্, একেবারে লোল হয়ে গেছে, হাড় সব বেরিয়ে গেছে, মুখে রেখার অরন্য—ভ্রূ পেকে সাদা হয়ে গেছে—চুল নেই—যে কয়খানা আছে তাও সাদা, ধব ধবে সাদা। একেবারে বুড়ো, একেবারে বুড়ো। এই বিশ্রি বীভৎস বার্দ্ধক্যবিকৃত মুখ দেখে তার সর্ব্ব-শরীর কাঁপতে লাগলো থর থর করে, বাঁধানো দাঁতে ধরলো শীত-কম্পন। তিনি যেন আর দাঁড়াতে পারছেন না। এতখানি কথা বলার এবং শরীরের চালনা এবং উত্তেজনার ফল এবার তিনি অনুভব করছেন। শরীর অবশ হয়ে আসছে—আর শক্তি নেই—দেহে বাক ধরেছে, চোখে অত্যন্ত ঘোর দেখছেন। কী আশ্চর্য ! প্রথম প্রেমের স্মৃতি তার ক্ষণিকের জন্যে উদ্দাম তারুণ্য এনে দিয়েছিল—সেটা একটা উচ্ছ্বাস তার পর নিজের আসল প্রতিচ্ছায়া যেই আয়নায় দেখলেন অমনি সেটা নিমিষে নিঃশেষ হয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেল, ফিরে এলো আবার সেই পঙ্গু বার্দ্ধক্য !

এতক্ষণ তিনি যেন অন্য চেতনায় ছিলেন, এবার জাগলেন, এবং অত্যন্ত আর্ত্ত ব্যাকুল কম্পিত কণ্ঠে বল্লেন : My stick, My stick !

শ্রীমতি চামেলী দেবী লাঠিটা এনে দিলেন। বৃদ্ধ হরলাল-বাবু লাঠি নিয়ে তাতে ভর দিয়ে ঠক্ ঠক্ করতে করতে কম্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন।

মাতাল ও স্বপ্ন

(উৎসর্গ—অন্নদাশঙ্কর রায়কে)

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৭ই কার্তিক, ১৩৪৫

মাতাল ও স্বপ্ন

সেনের ওখান থেকে ডিনার খেয়ে ফিরতে আমার বেশ খানিকটা রাত হ'য়ে গেল। আর পেগের মাত্রাটা যে একটু অতিরিক্ত রকম হয়েছে কলিংবেল্ টিপতে টিপতে সে কথা বিলক্ষণ বুঝতে পারলুম। সেখান থেকে রাত ক'রে ফেরা আজ আমার প্রথম নয় কিন্তু এমনি অবস্থা পূর্বে কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

কী আশ্চর্য! কারুর দরজা খোলার নাম নেই। প্রভুভক্ত ভৃত্যটির আজ হ'ল কী! আমার প্রতীক্ষায় প্রতিরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি জেগে থাকার পর আজ তো তার ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়।

অধৈর্য হ'য়ে দরজায় প্রচণ্ড কিক্ করতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ কিক্ করাও সম্ভব নয়। আমার সারা শরীর রীতিমতো টলচে। আঙুল আরম্ভ করেছে কাঁপতে। মাথার ভেতর কী যেন হ'তে লাগলো। তারপর বাস্, আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। আমি ট'লে পড়লাম।

অকস্মাৎ এক সময় দরজাটা গেল খুলে। একটা কড়া কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রভুভক্ত ভৃত্য নয়—সুসজ্জিতা সপ্রতিভ কোন মহিলা।

মুখ তার ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছিলাম না—ধোঁয়ার মতো কি যেন অনবরত উড়ছিল তার মুখের সামনে। বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'এসো,' সে আমার হাত ধরল। তাকে অনুসরণ ক'রে এলাম ড্রয়িং রুমে মন্ত্র চালিতের মতো।

একই সোফায় ব'সলাম আমরা দু'জন। আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কে এ মহিলা? বাড়ী ভুল করেনি তো? এত রাত্রে এলই বা কোথা থেকে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'আবার ড্রিঙ্ক্ আরম্ভ করেছ না?' ও জিজ্ঞেস করল। আশ্চর্য হলাম। সে-খবরও পেতে এর বাকি নেই। কিন্তু আমার চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কী চায় এ আমার কাছে? কে জানে! ওর কথার কোন উত্তর দিলাম না। একটা সিগারেট ধরালাম।

আবার ও বলল, 'shame! তোমাদের কথারও কী কোন দাম নেই?'

'দেখ,' এবার আর আমি কিছু না ব'লে থাকতে পারলাম না, 'তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। কে তুমি? তোমায় চিনি ব'লে তো মনে হচ্ছে না। বোধ হয় ভুল করে তুমি এখানে এসেছ,' এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে ফেললাম।

ও হাসল 'ভুল আমার হয় নি, বরং তোমারই হচ্ছে। তুমি আমায় চিনতে পারছ না—এরকম কথা তোমাদের মুখ থেকে শোনা কিছু আশ্চর্যের নয়। আমার কিন্তু তোমাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হয় নি।'

'থাক্ ওসব বাজে অর্থহীন কথা,' সিগারেটে টান মেরে বললাম, 'কী বলছিলে একটু আগে? Shame! আমাদের কথারও কোন দাম নেই—তার মানে?

'তার মানে খুব সোজা। তুমি একদিন আমায় কথা দিয়েছিলে জীবনে আর কোন দিন ড্রিঙ্ক করবে না। সে কথা তুমি রেখেওছিলে যতদিন আমি ছিলাম কিন্তু আমি চলে যাবার পর———'

'কী বলছ তুমি?' বাধা দিয়ে বললাম, 'কবে কথা দিয়েছিলাম, কবে তুমি আমার কাছে ছিলে আর কবেই বা চলে গেলে? আমি তো তোমার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছিনা। তুমি কী আমায় সত্যি করে বলবে কে তুমি? কেননা সত্যিই আমি তোমায় কিছুতেই চিনতে পারছি না।'

'চিনতে কষ্ট হবে জানি,' ও বলতে লাগল, 'একে পুরুষ মানুষ তার ওপর পূরো মাত্রায় ড্রিঙ্ক করেছ। যাক্, ভাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে দেখ তো চিনতে পার কী না—Look—'

চেয়ে দেখলাম, ভাল করেই। কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে। কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

'চিনতে পারলে ?

'না।'

'আবার দেখ অনেকক্ষণ ধ'রে।'

বেশ অনেকক্ষণ ধরেই দেখলাম। সহসা অমার মনে হল একে যেন কোথায় দেখেছি। এর ভাব ভঙ্গী একেবারে অপরিচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে করতে পারলাম না। আর ওর মুখের সামনে ধোঁয়া উড়ছিল অনবরত। মুখ আর কোন মতেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এবার আর থাকতে না পেরে অধৈর্য হ'য়ে বললাম, 'আমায় বল কে তুমি ?

কিছুতেই আজ আমি চিনতে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমায় দেখেছি।'

তীব্র তীক্ষ্ণ হাসিতে ওর ঠোঁট বিচ্ছুরিত হ'ল। তারপর কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল,' আমি লিলি—তোমার স্ত্রী।'

'What !' আমার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল কার্পেটের ওপর, 'তুমি লিলি !' সভয়ে দূরে সরে

বললাম, 'আরে তাইতো ! কিন্তু তুমি এলে কোথা থেকে, ?' আমার কপাল ঘামতে সুরু করেছে, 'এ তো অসম্ভব, আমি কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি ? লিলি তো অনেক দিন মরে গেছে—'

'আমি কোথা থেকে এসেছি সে-খবরে তোমার প্রয়োজন নেই কিন্তু তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন—'

'অর্থহীন, আমাকে তুমি যাদু করেছ—'

'আঃ, শোন চুপ ক'রে,' লিলি বলতে লাগলো, 'আমি এসেছি কেন জানো ?'

'না,' আমার বিস্ময় তখনো দূর হয়নি।

.'তোমার ড্রিঙ্কের মাত্রা সহ্য হল না ব'লে।'

কয়েক মুহূর্তের ছেদ।

'মনে পড়ে ? এক রাত্রে আজকের মতো এমনি অবস্থায় তুমি বাড়ী ফিরেছিলে আর আমি দরজা খুলে ঠিক আজকের মতোই এই ঘরে তোমায় হাত ধরে এনে বসিয়েছিলাম। আর সে-রাত্রে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আর কখনো ড্রিঙ্ক করবে না।

আমি জানতাম শুধু মুখে বললেও আমার বারণ তুমি শুনতে। তবু প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তা'হলে কোন মতে তুমি আর ভাঙবে না কেননা খুব বেশী ভাল তুমি আমায় বাসতে। কিন্তু কোথা থেকে কী যেন হঠাৎ হ'য়ে-গেল আমি তোমায় ছেড়ে গেলাম---' লিলি থামল।

তরল অন্ধকার ভরা শরতের গভীর রাত্রি। বিশাল আকাশ তারাহীন। শীতের অস্পষ্ট আমেজে আর রহস্যময় কোন কিছুর সূচনায় সমস্ত পৃথিবী যেন অকস্মাৎ বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে।

ভুলে যাওয়া সুখ-স্বপ্নের মতো সহসা আমার মনে ঝলসালো অতীতের কোন আবছা রাত্রির কথা। সত্যি, এক রাত্রে এমনি অবস্থায় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

আজ এই নিঃসাড় নিভৃত মায়াময় শরতের অদ্ভুত রাত্রে আমার চোখে ভীড় করলো, বিস্মৃতি-কীট যে দিনগুলি ধ্বংস করেছে, সেই বিগত স্বপ্ন-রঙীন দিনগুলি। বহু ম্লান মন্থর মৃতপ্রায় মুহূর্তকে বর্শাঘাত ক'রে আমার মন বর্ত্তমানের গণ্ডী পেরিয়ে এসে দাঁড়াল কুয়াশাময় অস্পষ্ট অতীতের সীমানায়।

একদিন আমি ভালবেসেছিলাম। আর সে-ভালবাসা আমায় সঞ্জীবিত করেছিল বিচিত্র উপাদানে। এই লিলির স্পর্শে বন্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আমি দুরন্ত দুর্বার হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমস্ত কিছুই একের পর এক নিঃশেষে শেষ করে ঢেলে দিয়েছিলাম লিলিকে। আর কানায় কানায় অন্তর ভরে উঠেছিল দেয়া উপহারের প্রাচুর্যে। আজ এই রাত্রে কেন সে অপ্রত্যাশিত স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে বার বার! সেই মৃত মুহূর্তগুলি অকস্মাৎ সজীবতার সাড়া পেয়ে মুহূর্তে যেন গানে গানে জীবন্ত হ'য়ে আমায় সুখ-সমৃদ্ধ করে তুললো।

কিন্তু সে দিন আর আজ! আমার সে-ভালবাসা পাতলা রঙীন কাঁচের মতো খান্ খান্ হ'য়ে ধূলিমলিন হ'য়ে এসেছে। লিলি এসেছে আমার পাশে। কিন্তু দু'জনের মাঝে স্ফীত হ'য়ে উঠেছে বিরাট অজগর। লিলিকে কামনা করতে পারছি, কাছে টেনে নিতে পারছি না। অতীতের অঙ্কিত সে-গাঢ়-রেখা মুছে গেছে।

কিছুই আর আজ অবশিষ্ট নেই! অপরিচিতার মতো লাগছে লিলিকে। সেই নিস্তব্ধ কক্ষে সাপের মতো হিস্ হিস্ ক'রে উঠছে শুধু আমাদের নিঃশ্বাস। প্রেতের ইসারায় চারধার যেন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

'কী ভাবছো?' লিলির কণ্ঠস্বর।

কোন উত্তর দিলাম না।

'শোন,' লিলি বলল, 'কেন এসেছি জানো?'

'না, তুমি তো এখনো কিছু বলনি।'

'একটা অনুরোধ ক'রবো, বল রাখবে?'

'কী তোমার অনুরোধ?'

'আগে কথা দাও রাখবে।'

'না শুনে কথা দেব কেমন ক'রে?'

'এ ধরণের কথা তোমার মুখ থেকে আমি আশা করিনি,' লিলির মুখ দেখে বোঝা গেল ও দুঃখিত হয়েছে, 'আগে আমার

সঙ্গে এমন ক'রে তুমি তো কথা বলতে না—কিছু না জিজ্ঞেস করেই কথা দিতে।'

সে-কথায় কান না দিয়ে বললাম, 'বল কী তোমার অনুরোধ ?'

একটু থেমে লিলি বলল, 'তোমায় মদ ছাড়তে হবে।'

'অসম্ভব,' সঙ্গে সঙ্গে বললাম।

'তার মানে ?' লিলি বেশ একটু আশ্চর্য হ'ল।

'মানে মদ ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তুমি কী আজ আমার কথাও শুনবে না ?'

'কেমন করে শুনব ? মদ ছাড়া যে কী কঠিন সে শুধু সেই জানে যে মাতাল হয়—তুমি তা' বুঝতে পারবে না।'

'চাই না বুঝতে—'

'Are you getting angry ?'

'Yes sir.'

'Why madam ?'

'কেন ? কেন তুমি আমার অনুরোধ রাখবে না আজ ?'

'এ তোমার অন্যায় অনুরোধ—'

'না না, কিছু অন্যায় নয়—'

'আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না লিলি—'

'আমি বলছি।'

'জানি—'

'তবু পারবে না?'

'না, সত্যি আমি পারবো না লিলি।'

চুপচাপ। বলবার কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। অথচ একদিন ছিল যে দিন আমাদের কথা শেষ হ'তনা।

এই নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে সহসা সাপের হিস্ হিস্ শব্দ আর প্রেতের অস্পষ্ট ইসারা সমস্ত ঘর খানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কী অদ্ভুত আবহাওয়া!

'মনে পড়ে আগে সপ্তায় তুমি পাঁচবার সিনেমায় যেতে?'

'পড়ে,' বললাম্।

'খরচ কমাবার জন্যে আমি সে-অভ্যাস ছাড়াই, মনে আছে সে কথা?'

'আছে।'

'অনেক রাত অবধি জেগে তুমি পড়তে, মনে আছে কী?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ হবে ব'লে আমি তা বন্ধ করলাম।'

'জানি,' অসহ্য মনে হচ্ছে আমার লিলিকে।

'মজা করবার জন্যে সাতদিন তোমায় সিগারেট না খাইয়ে রেখেছিলাম আর আমার কথায় সানন্দে সে ক'দিন তুমি smoke না ক'রে ছিলে, Do you remember?'

'Yes' বেশ তো চলে গিয়েছিল। কেন এল ও আজ!

'তুমি ছিলে আমার গর্ব, আমার কোন কথা কোন দিনও তুমি তো অবহেলা করনি,' লিলি আমার খুব কাছে সরে এসে একটা হাত ধরল, 'অতীতের সে-দাবী নিয়েই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি—তোমার স্ত্রী—তোমার লিলি—'

'আঃ,' আমার বিরক্তি প্রকাশ পেল। লিলির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'সরে যাও।'

আর এই 'সরে যাও' কথাটা যেন দেয়ালে-দেয়ালে মাথা ঠুকে আছড়ে চুরমার হয়ে পড়ল কক্ষের মাঝখানে। লিলি ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে সভয়ে সরে গেল দূরে। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সাপের নিঃশ্বাসে এখুনি ও যেন ভস্ম হয়ে যাবে। দীর্ণ ভগ্ন কণ্ঠে কারা প্রতিধ্বনি করতে লাগলো আমার কানে কানে, সরে যাও! সরে যাও!! সরে যাও!!!

সে—প্রতিধ্বনি ছাপিয়ে ভেঙে পড়ল লিলির কণ্ঠস্বর, 'কেন তুমি আমায় এমন করছ? আমি তো তোমারই সেই লিলি। কী পরিবর্তন হয়েছে আমার? বল বল কী পরিবর্তন—'

দু'জনেই একসঙ্গে রিষ্ট্ওয়াচ্ দেখলাম। আর হঠাৎ ঘড়িগুলো খুব জোরে-টিক্ টিক্ করতে লাগল। ক্রমে শব্দ যেন বেড়ে যাচ্ছে। জোরে···খুব জোরে······আর ও জোরে।

আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে সুরু করল। চোখ আমার

ঘড়ির দিকে আর কানে অসহ্য আওয়াজ। লিলি কী যেন বলতে চাইল কিন্তু ভীষন শব্দে তার প্রত্যেকটি কথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। কিছুই শুনতে পেলাম না। লিলি মিলিয়ে যাচ্ছে—অস্পষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আমার রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌ প্রকাণ্ড হয়ে চোখের সামনে চলে এল কেমন ক'রে? আর লিলি পড়ে রইল তার পেছনে। ওকে আর দেখা গেল না। আমার সামনে শুধু ঘড়ি! সময়ের কাঁটা দু'টো ঘুরে যাচ্ছে নিরন্তর!

* * * * *

পরদিন দেখলাম আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে একেবারে।

যথা সময়ে সে-ঘরে চা এনে প্রভুভক্ত ভৃত্যটি বলল, 'কাল রাত্তিরে সিড়ির কাছে আপনি পড়ে গিয়েছিলেন, আমি আর ড্রাইভার ধরাধরি ক'রে——'

'চুপ ক'র,' তাড়া দিয়ে আস্তে আস্তে কাপ্‌ নিঃশেষ করলাম।

কাঁটা

(উৎসর্গ—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে)

ফাল্গুনী রায়

সন্ধ্যা—৭টা

মঙ্গলবার

১৫ই আষাঢ়, ১৩৪৭

সেই যে কখন ট্রেন থামিয়াছে তো আর কথাই নাই, ছুটিয়া চলিয়াছে অবিরাম, অনিবার। বাহিরে বৈশাখী বাতাসের বন্ধন-হীন আর্ত্তনাদ। সান্ত্বনা তো জানালার ধারে মুখ রাখিয়া—এখন কী বিরক্ত করা উচিৎ?

সান্ত্বনা! চিন্তা করিতে লাগিলাম, সান্ত্বনা! কে চিনিত তাহাকে? কোথা হইতে আসিল অতর্কিতে না বলিয়া, না কহিয়া? লেখার গুণ? লেখা, লেখা হ্যাঁ লেখার ক্ষমতা আছে বটে, অমন উদ্ধতা-গর্ব্বিতা নারীকেও মুগ্ধ করা কী সহজ ব্যাপার! লেখা, লেখা শুধু সান্ত্বনা কেন? কত কাজরী, কেতকী, করবীকে দোলাইয়া দিয়াছে।

সান্ত্বনা—সান্ত্বনা, শান্ত-আঁখি সান্ত্বনা, আমার সকল সৃষ্টির মূল—আমার উৎসের উৎসাহ!......চিন্তা স্রোত ব্যাহত হইল। দেখিলাম সান্ত্বনার ঠোঁট নাড়িতেছে আমার পানেই চাহিয়া।

—কী ভাবছ?

—সান্ত্বনা বলিল।

—ভাবছি? হ্যাঁ, কী ভাবছিলাম সান্ত্বনা?

—বাঃ, তা আমি কী জানি? তুমি বেশ তো!

—তুমি জানোনা আমি কী ভাবি? আমি তো জানি তুমি কী ভাবো!

ইঙ্গিত কার্য্যকরী হইল, উত্তর আসিল ঃ তুমি লেখক, বড় লেখক, তোমার তো মানুষের হৃদয় নিয়েই ব্যবসা, তুমি জানতে পারো আমি কী ভাবী কিন্তু আমি কী পারি ?

বড় লেখক, হ্যাঁ সত্যিই তো বড় লেখক ! আমার সর্বোচ্চ কামনা শ্রেষ্ঠতম লেখক হইবার। সাধনা, মহাসাধনা বিরাট কিছু সৃষ্টি করিয়া যাইব—স্রষ্টার এই বিরাট সৃষ্টির মত। বলিতে পারিনা—বলিতে পারিনা কেন ? নিশ্চয়ই, নাহলে আমার কোনো সার্থকতাই থাকিবে না !

—সান্ত্বনা !

—ইস্ ট্রেন ঝড়ের সাগরের মতন গর্জন করিতেছে। কিছুই শ্রবণগম্য হয় না—যেন সব ডুবিয়া গেছে অতল তলায় ! সাগরের গর্জন আর আমাদের আলাপন ! সান্ত্বনা বলিতেছে, যেন শুনিতে পাইলাম ঃ উঃ কী ভীষন জোরে চলছে, যদি কলিসন হয়।

গর্জন থামিয়াছে। না থামিলেই হইত ভালো ! এত বড় আশঙ্কা কানে আসিত না।

কলিসন ? কলিসন হইবে ? ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ছারখার হইয়া যাইবে ট্রেনটি—আর্ত্ত আর্ত্তনাদ—তারপর কোথা হইতে আসিবে মৃত্যু দ্রুত পদক্ষেপে—একটির পর একটি লইয়া যাইবে ছিনাইয়া ? সান্ত্বকেও, আমাকেও ?

সান্ত্বনাকেও, আমাকেও ? না, না, সে কিছুতেই হইতে

পারে না। মৃত্যু, মৃত্যু—এত দ্রুত মৃত্যু? কী দান করিতে পারিলাম? জীবনের কী সাফল্য মণ্ডিত হইল? ইহার মধ্যেই মৃত্যু! ভাবিতেও শিহরণ লাগে!

—একথা বলতে নেই সান্ত্বনা। আবার সেই প্রচণ্ড প্রবল প্রপাতের মত হুঙ্কার! না আর আলাপনের কাজ নাই!

জানালার ধারে আসিলাম। সান্ত্বনাও বিপরীত জানালার ধারটিতে বসিল। কোন কাজ নাই। চাহিলাম—চাহিলাম বলিলে মিথ্যুক হইতে হয়। কারণ বাহিরে যেরূপ অবিশ্রান্ত অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছে—চাহিবার কাহার দুঃসাহস!

সুতরাং জানালার ধারটি ছাড়িয়া মাঝের সিটটিতে বসিলাম। পা ছড়াইয়া আরামে একটু ঘুমাইব মনে করিতেছি এমন সময় দেখি কম্পারট্মেণ্টের এক কোণে কত গুলো নীল কাগজ। আশ্চর্য! একটি নয়, সাত-আটটি। গুচ্ছিত। উঠিয়া সে গুলি কুড়াইলাম। বেশ সুন্দর, স্বচ্ছ লেখা। দেখিলেই চোখ জুড়ায়—ভালোবাসিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে!

কাহার লেখা কে জানে? হয়তো যে কোন নবীন সাহিত্যিক ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে—আর পড়িল কিনা আমারই ভাগ্যে, সাহিত্যিকের ভাগ্যে? কোন গ্রহের অনুগ্রহে, তা কে বলিতে পারে?

কোনো তো কাজ নাই সুতরাং উলটাইতে লাগিলাম। না,

ছাড়িতে পারা যায়না, প্রতিটি অক্ষর মুগ্ধ করিতেছে। আর খাপছাড়া অবস্থায় না পড়িয়া সুরু হইতে পড়িতে সুরু করিলাম !

'গল্প'। "কাঁটা।"

পড়িলাম : স্বর্গ-ভ্রষ্ট সে, নইলে তার ক্ষমতা এত এলো কোথা থেকে ? লেখনী তার সৃষ্টি করে এসব কী ? একী মানুষের লেখা ? ভুল হয়। বাস্তবিক দিগন্ত যা লেখে ! কী-না ওর লেখায় ধরা দেয় ? কোন অলক্ষিত মানুষের চরিত্রের দিক, কোন হীন-জন্মা নারীর ব্যথা-স্তিমিত ম্রিয়মান মুহূর্ত্ত-গুলো, — কি-না !

স্রষ্টা সে, মহান সে ! বুকের রক্ত, তাজা তপ্ত রঙ্গিন রক্ত নিংড়ে সে সৃষ্টি করে তার কাহিনী। কত যুগের সাধনার পর তাই এমন একটি অসামান্য ক্ষমতাপন্ন স্রষ্টার সৃষ্টি হয়েছে এই মাটির পৃথিবীতে ; তা কেউ জানেনা। জানে শুধু তার আজকের দিগন্তকে—তরুণ সবুজতম দিগন্তকে। জানে এই দিগন্ত বাংলার সারা কলঙ্ক মোচন করবে, পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে নাম — দিগন্তের নাম — দিগন্তের হয়ে বাংলার নাম। হয়তো বলবে এসব কী ? একি কোনো দেবতার লেখা ? দেবতা, দেবতা, কেন মানুষ কী সৃষ্টি করতে পারে না, মানুষ, দিগন্তের মত মানুষ ?

এক সঙ্গে তার লেখায় ধরা দেয় গম্ভীর আর্ত্তনাদ, অন্ধ সাগরের আলোর কাতর প্রার্থনা, আর এই পুরানো পৃথিবীর পুরানো পুরানো সংস্কারের মুক্তির জন্যে করুণ কাকুতি !

সে যেন বিজয়-নিশান সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে চলেছে শুধু সামনে জয়োল্লাসে। আর তার চার ধারে পুরানো জীর্ণ লেখনীধরেরা শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। তারা কিছু বলতে পারেনা—তার আগুনের সর্বভুক্ হুঙ্কায় তারা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। দিগন্ত, অসীম তোমার ক্ষমতা, তুমি ধন্য !

দিগন্ত লিখে যাচ্ছে। সারি সারি সব অক্ষর চলছে। অক্ষরের শোভাযাত্রা, সবুজ অক্ষরের। থামেনা, আহত হয়না। অবাধ তার গতি, উত্তাল উচ্ছল, প্রথম বন্যার মত ! দিগন্ত কোথায় ? দিগন্ত কোথায় ? দিগন্ত ডুবে গেছে কোন পথ হারা গহন অরণ্যে। আলো নেই—এতটুকু ফিকে আলো নেই। দিগন্ত চলেছে, আলো জ্বালতে হবে। সে চলেছে বিরাট আশা বুকে করে। তাকে বাঁচাতে হবে লক্ষ লক্ষ অন্ধ মানব-মানবীকে ; তারা তার মুখ চেয়ে আছে যেন কত হাজার হাজার বছর ধরে।

গহন অরণ্য, সূর্য যেখানে মরে গেছে, মরে গেছে চাঁদ ও তারা। যেখানে আছে শুধু বড় বড় বনস্পতির ভীড়, তাদের জটিল জটায় জটায় পুঞ্জিভূত জঞ্জাল—উদ্দাম বাতাসে তারা

অজানা ভাষায় মর্ মর্ করে উঠছে ঃ মুক্তি দাও, মুক্ত করো এ অন্ধ অন্ধকার গহ্বর হতে—ওগো স্রষ্টা, আমরা তোমারই মুখ চেয়ে আছি, তোমার ওই সোনালী কাঠির পরশে আমাদের মুক্তি দাও।

দিগন্ত চলেছে। মুহূর্ত্তের যাত্রা যেন ক্ষণ-নিশ্চল। সব নিশ্চুপ। শব্দ নেই, এতটুক্? তাও নেই। মহা আশঙ্কা দিগন্তের বুকে। প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন দ্রুততম ঝরছে। মহা আশঙ্কা অন্ধ পৃথিবীর বুকে, অন্ধ পুরানো পৃথিবীর শত-জীর্ণ বনস্পতির বুকে। দিগন্তের পদক্ষেপ ধীর। অন্ধকারমৃত নদীর মত নিথর। যেন ও চলেছে সৃষ্টির আদিম প্রভাতে। ওর হাতে সোনার কাঠি। ও দেবে ওদের মুক্তি—মুক্তি চির দিনের। দিগন্ত চলেছে। অবিরাম ওর চলা, নেই ছেদ, নেই বিরতি।

ধুক্—দরজায় কার কোমল করাঘাত, কঙ্কন—কিনি কিনি, শাড়ীর খসখসানি।......

একটা বিরাট স্তব্ধতা। যেন ঝড় জাগবে, অট্টালিকা সমুদ্র চূর্ণ বিচূর্ণ করে রুদ্র ঝড়ের ঘোড়ারা জাগবে। তারি প্রতীক্ষায় প্রতি পলে পলে প্রকৃতি থম থম করছে। সোনার কাঠির পরশ। আলো, আলো, ছেয়ে গেল আলোয়, কালো গেল ধুয়ে। আলো, আলো, আলোর ঝড়। জেগে উঠেছে যেন অন্ধ প্রাচীন বনস্পতির দল—মর্ম্মর—মর্ম্মর!

—ঠুক্ !—আবার সেই মৃদু কর-পরশ, আবার সেই কঙ্কণ-ঝঙ্কার ! না, তার শোনবার উপায় নেই। এখনো সময় হয়নি। এখনো তারা পূর্ণ মুক্তি পায়নি ; এখনো তার বন্দীরা শৃঙ্খল-মুক্ত হয়নি। তার সামনে বিশাল সম্ভাবনা, বিরাট সাধনা। ওসব তুচ্ছ দিকে কান ও প্রাণ পাতবার সময় তার নেই। সে সাধক—মহাসাধক—সাধনাই তার সব, পরম ও চরম ব্রত। ওদের ও দেখেনি কখনো—দেখবেও না।

দরজা খোলো, আর কতক্ষণ লিখবে ? পাশের বাড়ীর মেয়েটির গলা। উপমা ?—নদীর কলগান। পরনে তার সবুজ শাড়ী—ঘন সবুজ শাড়ী তার সমস্ত শরীর জড়িয়ে ধরেছে সবুজ সাপের মত। কী ঘন কালো চুল ! উপমা ?—যেন হাজার হাজার গহন রাত্রি ঘুমিয়ে পড়েছে গহীন ঘুমে। চোখ ?—স্বপ্নের ছায়া-ছাওয়া—

যেন দেবতার তপোভঙ্গ হ'লো।

টেবিল থেকে উঠে দিগন্ত এলো ! ও মুগ্ধ হ'য়ে গেল ওকে দেখে। ওর চোখে কে যেন স্বপ্ন-কাজল বুলিয়ে দিয়েছে। কই ? এত সুন্দরতো কখনো ছিলোনা ? যেন শিশিরের ঝরনায় স্নান করে এলো। দিগন্তের চাপল্য। দিগন্তের প্রশ্ন : কী মনে করে ?

বহ্নির (মেয়েটির নাম) উত্তর: তোমায় দেখতে এলাম, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম—কতক্ষণ দরজায় ধাক্কা দিলাম, তা উত্তরই তো দিলে না!

—না, অন্য মনস্কছিলাম, লেখাটা শেষ করে তো?

—কী অত লেখ, দেখি, আমি রোজই আসি, রোজই লেখ তুমি!

—আমার তো ওই সব।

দিগন্তের সুরে গাম্ভীর্য্য!

হয়তো একটু ক্ষোভ—বহ্নির জিজ্ঞাসা: কত দিন পরে শেষ হ'বে?

—শেষ হয়না—ওকি কখনো শেষ হয়? সৃষ্টির শেষ কখনো হয় না।

—আমি অত বুঝিনে বাপু, আর কত দিন লিখবে তাই বলো না ছাই!

—লিখবো যত দিন বাঁচব! লেখাইতো আমার সব—তা যাক, তোমার কী কোনো কাজ আছে?

যেন ইঙ্গিতটি বহ্নি বুঝতে পারবেনা!

—কেন কাজ না থাকলে কী আসতে নেই, নাও আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি তুমি লেখ, যত খুসী লেখ, আমি থাকলেই সব অনর্থ ঘটবে, লেখো যত পারো, আমি যাই……

বহ্নির চোখ ছল ছল করে ওঠে রুদ্ধ অশ্রুতে। ও ব্যথিতা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দিগন্ত অবাক হ'য়ে গেল। তার ইঙ্গিত যে এত মর্ম্মান্তিক ভাবে ক্রীয়াময় হ'বে, তা ও ভাবতেই পারেনি। কোথায় যেন ওর বিঁধলো। হয়তো দিগন্তের একটু প্রচ্ছন্ন আঘাত লাগলো। স্রষ্টা দিগন্ত ভাবতে থাকে। সে ভাবনা অন্য রকম! তার আজ একি হ'লো!

পরদিন।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। দিগন্তের ঘরে নীল আলো আগেকার মতই জ্বলছে। বাহিরে ভীষণ বরষণ—বজ্রের ডম্বরু, বিদ্যুৎ-ঝলকানি!

দিগন্ত লিখছে। বৃষ্টির রিমিঝিমির তালে তালে যেন সমস্ত ঘরটি দুলছে। দিগন্ত হঠাৎ উঠে বসলো। নীল কাগজ যেন তার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে। তার কলম যেন বলছেঃ কী হ'লো বন্ধু? সে বাইরে দেখলো। ঝাপসা হ'য়ে গেছে—অন্ধ হ'য়ে গেছে রাত্রি—চাঁদের সিঁথি লুপ্ত—বিধবা চাঁদ—তাও বা কোথায়?

দিগন্ত আবার বসলো। লিখছে, লিখছে, দিগন্ত আবার লিখছে। কালকের সেই গল্পটা শেষ করতে হ'বে।

দিগন্ত লিখে চলেছে। কলম যেন নাচের তালে তালে ছন্দিত। চলেছে সে দ্রুত পদক্ষেপে। দিগন্ত লিখছে—আবার লিখছে। বয়ে চলেছে কালির বন্যা, মুক্তার মত টলটলে। আবার সে পৌছিয়েছে সেই গহন অরণ্যে ! কিন্তু আজ তারা কোথায় ? না, পথ হারিয়েছে। এ তো সেই অরণ্য নয়। দিগন্ত থামলো। কালির স্রোত রুদ্ধ। কলম যেন কাগজে কালো ম্লান হয়ে শুয়ে আছে।

দিগন্ত আবার বাইরে এলো। কী যেন ওর মনে হ'চ্ছে। কী যেন ওর ছিল—কী যেন ওর হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে কোন অতল তলায়, হারিয়ে গেছে বোধ হয় কালকের রাত্রির অনন্ত গহ্বরে। দিগন্ত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে। বৃষ্টির ঝাপটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল তার সমস্ত দেহ। দিগন্ত যেন কার অধীর প্রতীক্ষা করছে। কে যেন আসবে ওর কাছে—কে যেন বসবে ওর কাছে !

ঠুক্···পরিচিত সঙ্কেত, পরিচিত কঙ্কণঝঙ্কার, পরিচিত শাড়ীর খস্‌খসানি !

—এসো !

ভিতরে যে প্রবেশ করলো সে আর কেউ নয়, বহ্নি। ঝলমল করে হেসে উঠলো—একি করেছ, গা যে একেবারে ভিজে গেছে, ইস, শীগ্‌গীরই মুছে ফেল, অসুখ করবে যে !

—বলো বহ্নি, তোমার কথাই……

—ভাবছিলে ? না ? তুমি যে মিথ্যুক সে আমি বেশ জানি !—

—মানে ? আমি সত্যি বলছি !

—ও, তাই নাকি ! কই এক দিনো তো শুনিনি।

—আজকে শুনলে—সত্যি ! তার পর কথার মোড় ঘুড়িয়ে, কাল আমার উপর খুব রাগ করেছ, না ? সত্যিই আমি কাল একটু দোষ করে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করো—করলে তো, বলো করলে !

হঠাৎ বাইরে একটা কোলাহল। ভীষণ কিছু নয় বহ্নির মা ডাকছেন মেয়ের নাম ধরে। তাঁর ডাকার অর্থ হ'চ্ছে শীগ্‌গীর বাড়ী ফেরা—এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়—একটু জরুরী কাজ আছে। সুতরাং বহ্নিকে উঠতে হ'লো।

—আমি যাই দিগন্তদা, মা ডাকছেন !

—এর মধ্যেই যাবে ?

কোনো দিন কী ধরে রাখার এমন মিনতি করেছ ? দিগন্ত বলে ঃ আবার এসো, বুঝলে !

—আচ্ছা, আসি এখন, কেমন ?

বলে বন-ঝরনার মত চঞ্চল পায়ে ছুটে চলে গেল।

দিগন্ত ভাবছে ঃ দিগন্ত তলিয়ে গেছে ভাবনার তলহীন পাথারে। তার মাঝে ফুটে উঠলো কতকগুলি মানুষের মুখ। তাঁরা যেন সব এক এক করে বলছে ঃ বাংলার গৌরব, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক—কী হ'লো তোমার, কী হ'লো, তোমার প্রতিভা, তোমার সোনার খ্যাতি যে চূরমার হ'তে চল্লো।......

দিগন্ত আর ভাবতে পারেনা—আরো কত লক্ষ লোকের মুখ সকলকে কী মনে করা যায় ?

হ্যাঁ করা যায় আর এক জনকে—সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তারি মুখ খানি।

দিগন্ত ভাবতে লাগলো। বহ্নি, বহ্নি, কথা কওয়ার কী মনোরম ভঙ্গিমা, কী প্রাণ দোলানো চাউনি-রাশি! বহ্নিকে, বহ্নিকেই ভাবতে থাকে!

আবার মনে হ'লো তার লেখা ? লেখা তার জীবনের এক মাত্র সাধনা, পরম ও চরম। তাকে কী মনে পড়েনা ? কী তার লেখা, কী সে সৃষ্টি করে সে নিজেই আশ্চর্য হ'য়ে যায়।

দিগন্ত আবার বসে। ঘরে সেই নীল বালব আজো স্বপন ঢালে। টেবিলের 'পরে কলমটি উপেক্ষিতা নায়িকার মত স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে আছে। দিগন্ত কলম ধরলো। দিগন্ত লিখছে, চলেছে সারি সারি অক্ষর লীলায়িত হ'য়ে চল-চঞ্চল হ'য়ে। দিগন্ত ডুবে গেছে ফের। মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে রুদ্র আনন্দে।

কাঁটা

পুরানো দিন আজ আবার ধরা দিয়েছে। দিগন্তের পা কাঁপতে থাকে। গায়ে শিহরণ লাগে। কে বললে তার প্রতিভা লুপ্ত হ'য়েছে? কে বললে? দিগন্ত আপন মনেই বলে উঠলো। তার প্রতিভা, বিরাট প্রতিভা কী করে লুপ্ত হ'বে? হ'তে পারেনা, হ'তে পারে না।······

দরজায় সেই কর-পরশ, সেই কঙ্কণঝঙ্কার, সেই শাড়ীর খস্‌খসানি।

—এসো—আমন্ত্রণ!

—কী করছ দিগন্তদা?

—লিখছি······

যেন কী রকম জুড়ানো উত্তর, এই উত্তরে সেই আগের উত্তাপ নেই।

—কী লিখতেই তুমি পারো, বাবা ঃ একেবারে রেকারিং—থামেইনা!······

বহ্নির হাসি। ওর ঠোঁটে আজ এত রক্তিমা কেন? ওকি কিছু বলবে?

—দিগন্তদা আজ ভারী মজা হ'য়েছে।

—কী মজা?

দিগন্তের কৌতুহল।

—আগে বল কাউকে বলবেনা!

ওর চোখ কী ঘন কালো। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে দ্বিগুণ কালো হয়!

—না—না, তুমি বলো!

—চন্দ্রিলা বলছিল…

যেন দিগন্ত চন্দ্রিলাকে চেনে—খুব ভালো করে—মেয়েদের কথাই অমনি!

—কী বলছিল?

যেন দিগন্ত ও চন্দ্রিলাকে চেনে—তবে ওকে দোষ দেওয়া যায়না—অদম্য কৌতূহল!

—বলছিল—

চার ধারে চকিত-চাউনি।

—কী—কী?

—বলছিল, দিগন্তদার ওখানে কেন যাও বলো তো, আর রাত দিন শুধু ওর কথা কেন? আমি কী বল্লাম জানো?

—কী বললে?

বহ্নি কী জানেনা দিগন্তের কৌতূহল বেড়েই চলেছে!

—আমি বল্লাম—এসো—এসো আর একটু কাছে—আরো, আরো!

তার মানে কানে—মুখে কথা হ'লো। কী যে হ'লো তা আমরা আড়ি পেতে শুনিনি তবে মনে হয় সেই চির পুরাতন ভালো বাসা বাসির কথা!

—সত্যি! সত্যি !!

দিগন্তের চোখে অজস্র হর্ষ!

—হ্যাঁ, কেন বলবনা, নিশ্চয়ই বলব।

—সত্যি, সত্যি !!

দিগন্ত সামলাতে না পেরে উদ্দাম আবেগে বহ্নিকে বুকের ভিতর টেনে আনে। বহ্নি নিজেকে মুক্ত করে নিলে ব্যাগ্র বুভুক্ষু বাহুর থেকে। তার স্নায়ু ঝিমিয়ে এসেছে। এতক্ষণ ও কোন দেশে ছিল?

এরপর বহু দিন বয়ে গেছে। তার পর এক দিন। দিগন্ত আবার ভাবছে। ভাবনা, ভাবনা, এই ভাবনাই ওকে ঘিরে রেখেছে। ভাবছেঃ বহু দিন লেখা হয়নি, হয়তো বা এক মাস। কত রাত্রি তার ব'য়ে গেছে বন্ধা হ'য়ে। কত রাত্রি, রাত্রির পর রাত্রি, অজস্র রাত্রি। তার কালি হয়তো শুকিয়ে ঝরে গেছে, কলম শূন্য, করুণ নয়নে চেয়ে আছেঃ বন্ধু, কী হ'লো?

কী হ'লো? কী হ'লো?

দিগন্ত লিখছে, কলম ওর হাতে। আবার দিগন্ত লিখছে এক মনে, চলেছে সেই শব্দের বন্যা। লিখছে, লিখছে সে আবার অনেক, অনেক রাত্রির পর সে লিখছে।···

দিগন্ত লিখে চলেছে। অবিশ্রাম। অবিরাম। অনিবার। অফুরন্ত। অক্লান্ত। সময়ের মত তার গতি, অবাধ। পাতার পর পাতা—পাতার পাথার !

একি ! আজ ওর কলম থামেনা কেন? ওকি উন্মত্ত হ'লো নাকি?

শেষে ওর ক্লান্তি এলো। ওর লেখা শেষ হ'লো। চোখ মেলে চেয়ে দেখে—একি ! একি !! একি !!! ওকি লিখেছে এতক্ষণ ! কী লিখেছে এতক্ষণ !!

—বহ্নি তুমিই আমার সব, আমার সকল কিছু।······

অজান্তে ও লিখে চলেছে শুধু ওই কয়েকটি শব্দ কত হাজার বার, কত লক্ষ লক্ষ বার তার ইয়ত্তা নেই !

—দিগন্তদা—

—কী ?

—একটা কথার জবাব দেবে ?

—বলো !

—পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে কাকে তুমি বেশী ভালোবাসো ?

—তুমি জানো ?

—জানি।

—কাকে বলতো ?

—লেখাকে ? না ?

—না, না, না, ভুল।

—তবে ?

—তোমায়, তোমায় আমি সবার চেয়ে ভালোবাসি, তুমিই আমার সব বহ্নি, আমার সব !

—তবে তুমি তোমার ওই যত লেখা পুড়িয়ে ফেলতে পারো ? পরীক্ষা, কাকে বেশী ভালোবাসার !

—হ্যাঁ, পারি, পারি !

—পারো ? তবে পুড়িয়ে ফেল আমার চোখের সামনে !

—দেখবে, বহ্নি, এই দেখ ! এই দেখ ! সমস্ত লেখা কলম কালী, সমালোচনা, কত অজস্র প্রশংসা, পুড়ে গেলে দাউ দাউ করে। বহ্নির চোখে জয়োল্লাস, নিষ্ঠুর উল্লাস।...

দিগন্ত বল্লেঃ দেখলে বহ্নি, দেখলে ওসব আমি পুড়িয়ে দিলাম—আমার ওসব কিছুই ভালো লাগে না—কিছুই না—চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায় ?

—বাইরে, পৃথিবীহীন জায়গায়, যাবে ?

—যাবো !

কিন্তু যাবো বললেই হয়না। যা ভাবা যায়না সব সময়ে

তা হয়না, সেই অতি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হ'লো। কেননা বাঙ্কি বাগদত্তাই হ'য়ে ছিল এবং একদিন তার বিয়েও হয়ে গেল। কেন? কিসের অত বন্ধন, মেয়েদের আবার বন্ধন!

আর দিগন্ত? দিগন্তকে এর পর দেখা গেল তার টেবিলের উপর কপালে হাত রেখে—উস্কুখুস্কু চুলে, যেন কত কোটি বছরের ক্লান্তি সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো, চোখ দুটি বিভ্রান্ত—ব্যর্থ একটি প্রেতের মত। তার লেখার যেখানে ভস্ম শেষ ছিল সেখানে মাথা রেখে শুয়ে আছে—তার লেখার—তার প্রাণের এক মাত্র সাধনা, লেখার! আর মাঝে মাঝে উন্মাদের মতন চীৎকার করে বলছে: কাঁ—টা,—কাঁ—টা,—কাঁ—টা।

শেষ করিলাম, গল্পটি শেষ করিলাম। গল্পটি চমৎকার কিনা সে বিচার করিবার শক্তি আমার আপাততঃ নাই—কেননা আমাকে মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে—আমার বিচারের যেটুকু ক্ষীণতম শক্তি হয়তো ছিল তাহা হরণ করিয়া নিয়াছে। পাঠক কিংবা সমালোচকরা হয়তো ইহাকে উড়াইয়া দিবে—বলিবে: এ আবারগল্প, কিছু নাই, জমাট বাঁধে নাই, কোনো রকম ছাপ দিয়া যায় না, ইত্যাদি!……

কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সুগভীর ইঙ্গিত আমাকে, লেখক ফাল্গুনী রায়কে নিবিড় ভাবে ভাবাইয়া তুলিল।……

হাজার যোজন দূরে

(উৎসর্গ—প্রবোধকুমার সান্যালকে)

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সকাল—৭টা। সোমবার

৩০শে বৈশাখ, ১৩৪৭

হাজার যোজন দূরে

সেই সব পুরাণো পথ, সেই পরিচিত চারধার আজ এই অতীর অন্ধকারে বড় বিচিত্র লাগিতেছে—বড় অপরিচিত।

কী পরিবর্তনই যে হইয়াছে এই দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে! কোথায় সেই মাঠ? সেই বাড়ী! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ!! কিছুই আর নাই। সমস্ত কিছুই বদলাইয়া গেছে। অনেক নূতন বাড়ী অজয়ের চোখে পড়িতেছে আজ—অনেক নূতন জিনিষ। ক্লান্ত পদক্ষেপে সে চলিতে লাগিল।

এমনি করিয়া এত শীঘ্র অজয়ের ফিরিবার কথা ছিল না। জেল তাহার অনেক বছরের জন্যই হইয়াছিল—অনেক কারণে। শ্রমিক আন্দোলনের সে ছিল পাণ্ডা—কত বক্তৃতা কত দিন সে করিয়াছে। পুলিশ অনেক দিন হইতেই অজয়কে চোখ রাঙাইতেছিল। তাহার উপর জেলের বিশিষ্ট কোন কর্মচারীকে সে অপমান করে। এই সমস্ত কারণে অজয়ের ধারণা ছিল কারাকক্ষের বাহিরে শীঘ্র সে পা গলাইতে পারিবে না।

কিন্তু বছর কয়েক পর কোথা হইতে কি যেন হইয়া গেল। অকস্মাৎ অনেককে মুক্তি দেওয়া হইল। সেই অনেকের মধ্যে অজয়ও একজন।

আজ জেল হইতে অজয় বাহির হইয়াছে। বাহির হইয়া প্রথমে তাহার বড় আশ্চর্য লাগিল। আজ সে মুক্ত। কিন্তু কোথায় মুক্তির আনন্দ! কেন এমন নিরানন্দ আর অসহায় লাগিতেছে তাহার! এই কয়েক বছরের মধ্যে সে যেন সমস্ত শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে—সমস্ত উদ্যম! কেন এমন হয়!

জেলে যাইতে অজয় চাহে নাই। যাহারা প্রকৃত কর্মী জেলে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিতে তাহারা চায়না। তাই জেল হইবে শুনিয়া অজয় প্রথমটায় একটু চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

অজয়কে গরীবের ছেলেই বলা যায়। একমাত্র ছেলে সে। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই সে কেমন যেন একটু অন্য ধরণের। প্রথমে বাপ মা তাহার উপর অনেক আশা করিয়াছিল। হাজার হইলেও ছেলে তো! তারপর আস্তে আস্তে তাদের সে—আশা ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অজয় যে লেখাপড়া শিখে নাই তাহা নয়—অনেক দূর অবধি সে পড়িয়াছিল। ইচ্ছা করিলে একটা ভালো চাকরী হয়তো সে পাইতে পারিত। বাপ মা তাহাই চাহিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল অজয় চাকরী করিয়া সংসারের সমস্ত দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু সুবোধ ছেলের মত সুখের সংসার করিবার পাত্র অজয় নয়। চিরকাল সে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। ঘরে সে বড় একটা থাকিত না। বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করিতে যাওয়া, মজুরদের লেখাপড়া

শেখানো, শ্রমিক সঙ্ঘে বক্তৃতা দেয়া প্রভৃতি লইয়া সে এত বেশী ব্যস্ত থাকিত যাহার জন্য সংসারের দিকে মন দিবার সময় তাহার ছিল না।'

'আচ্ছা অজয়,' যোগেন বাবু বলিতেন, 'তুই কি চিরদিন এমনি থাকবি ?'

'কেন বাবা ?' অজয় হাসিত।

'আমার একমাত্র ছেলে তুই।'

'তা' বলে দেশের কাজ করব না ?'

'দেশের কাজ করতে তোকে কে বারণ করছে, কিন্তু চাকরী তোকে যে একটা করতে হবে।'

'সময় কোথায় বাবা ?'

'তা বললে তো চলবে না, তুই যে গরীবের ছেলে।'

'এক ছেলে আমি, তুমি কিছু ভেব না।'

যোগেন বাবু আর কিছু বলেন না, অন্য কক্ষে চলিয়া যান। অনেক বুঝাইয়াছেন তিনি অজয়কে। কিন্তু ছেলে অবুঝ।

রাজবালা ছেলেকে আরও বেশী ভাল বাসিতেন। একটি মাত্র ছেলেকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেই যেন তিনি বাঁচেন। কিন্তু আঁচলে বাঁধিয়া রাখা তো দূরের কথা, ছেলেকে কাছে পাইতেন তিনি খুব কম। কর্মক্লান্ত দেহে অজয় যখন গৃহে ফিরিত তাহার সে-চেহারা দেখিয়া রাজবালা অত্যন্ত ব্যস্ত

হইয়া পড়িতেন। এত বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে মাঝে মাঝে অজয়, রাগিয়া যাইত।

'কি কর মা, আমি কি ননীর পুতুল নাকি?'

'অসুখ—বিসুখ হতে পারে অজয়, জামাটা বদলে ফেল একেবারে ঘেমে গেছে, জল খাসনা এখন এই নেবুর সরবৎটুকু খেয়ে নে। কেন এমন দিন রাত ঘুরে বেড়াস বল তো? আমার কথা একটুও ভাবিস না তুই!'

তারপর একদিন অজয়ের বিবাহ হইল। মিনতি আসিল ঘর আলো করিয়া।

বিবাহ করিবার ইচ্ছা কিন্তু অজয়ের একেবারেই ছিল না। তাহার এই ছন্নছাড়া জীবনে কাহাকেও জড়াইতে সে চাহে নাই। একপ্রকার জোর করিয়াই অজয়ের বিবাহ দেয়া হইয়াছিল বলিতে গেলে। রাজবালা কিছুতেই ছাড়িবেন না, যোগেন বাবু সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—এমন অবস্থা হইল যে অজয়ের আর না বলিবার উপায় রহিল না। সে মনে মনে হাসিল। মা বাবা ভাবিয়াছিলেন বিবাহ হইলে অজয়ের দেশ-মাতৃকার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া আসিবে। বিবাহের ঠিক মাস চারেক পরই অজয়ের জেল হইল।

বজ্রাঘাত হইল যেন। অজয় মনে মনে কল্পনা করে। হাঁ নিশ্চয়ই বাড়ীর প্রত্যেকে বজ্রাঘাতের মতই এ সংবাদ গ্রহণ

করিয়াছিল। যোগেনবাবু সহজে বিচলিত হন না। তবু তাহারও চোখে হয়তো জল আসিয়াছিল। আর রাজবালা? তিনি হয়তো কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়াছিলেন। কতদিন জলস্পর্শ করেন নাই কে জানে! এই পাগলী মায়ের কথা কারাকক্ষে অনেকবার অজয় মনে করিয়াছে।

আর মিনতি কি করিয়াছিল? সেও কি জলস্পর্শ করে নাই অনেক দিন। অজয় তাহাকে অনেক দিন অনেক রকম করিয়া নিজের কথা বুঝাইয়া বলিয়াছে।

'আচ্ছা মিনতি, আমায় বিয়ে করে তোমার দুঃখ হয় না?'

'কেন বল তো?' মিনতি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত। এ হাসি অজয়ের বড় ভাল লাগে। বস্তুত, মিনতি এমন এক মেয়ে যাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। প্রাণের উচ্ছল বন্যায় সে চঞ্চল। সমস্ত দুঃখ-দৈন্য, জ্বালা-যন্ত্রনা হাল্কা হাসিতে তৃণের মত সে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

তারপর অজয় বলিত, 'আমি তোমায় দুঃখ দিই বলে।'

'দুঃখ? কিসের দুঃখ?'

'সব সময় তোমার কাছে থাকতে পারি না।'

'পুরুষ মানুষ সব সময় স্ত্রীর কাছে বসে থাকবে কি গো!' মিনতি ইচ্ছা করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'মিনতি, যদি কখনও আমার জেল হয় ?'

'জেল !' মিনতি চমকাইয়া উঠিত, 'জেল হবে কেন ? কি যে বল যা তা !'

'বলা যায় কি, যে-কোন মুহূর্তে আমার জেল হতে পারে।'

'যাঃ, ওকথা ব'ল না।'

'অমন মুখ কালো ক'র না মিনতি,' অজয় বুঝাইতে চেষ্টা করিত, 'আমার জেল হবে সে তো সুখের কথা, তোমার স্বামী দেশের জন্যে জেলে গেছে এতে দুঃখের কি আছে ? এতো সুখের কথা মিনতি।'

মিনতি উত্তর দিতনা।

'আমি জানি,' অজয় বলিত, 'আমায় ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে আমি ভুলতে পারি না দেশের অনেকের দুঃখ তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী। আমায় তুমি ভুল বুঝ না মিনতি।'

'কোন দিনও তো তোমায় ভুল বুঝিনি আমি।'

'তোমাকে সুখী করতে পারলাম না একি আমার কম দুঃখ !'

'থাক,' মিনতি রাগিয়া যাইত, 'আর থিয়েটারী ঢং দেখাতে হবে না। আমি অসুখী একথা তোমায় কোন মুখপোড়া বলেছে শুনি ?'

'আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয়। তোমার যা পাওনা তার সিকি ভাগও তোমায় আমি দিতে পারলাম না—'

'থামো থামো,' মিনতি বাধা দেয়, 'তুমি যে একটা হোমরা-চোমরা বক্তৃতাবাগীশ সে—খবর জানতে আমার বাকি নেই।'

অজয় হাসে।

'কিন্তু সত্যি তোমার জেল হবে নাকি গো?'

'হ্যাঁ মিনতি সত্যি হবে,' একটু থামিয়া অজয় বলিত, 'এখানে দেশকে ভালবাসা অন্যায়। দেশের সেবা করলে শাস্তি পেতে হয়, কারাগারে গিয়ে তিল্ তিল্ করে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়। জানো মিনতি দেশকে ভালবাসলে তাদের আর কিছুই থাকে না—নিঃস্ব, রিক্ত, পথের কাঙাল তারা। মিনতি তোমায় যে আমি কিছুই দিতে পারছি না—কিছু না।'

'ওগো, তুমি সমস্ত দাও তোমার দেশকে আমি কিছুই চাই না।'

'কিছু না? কিছুই কি তুমি আমার কাছ থেকে চাও না মিনতি?'

'না, দেশকে যা দেবে সেই তো আমার পরম পাওয়া। আর কিছু আমি চাই না।'

'সত্যি বলছ?'

'আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।'

'কোন দুঃখই কি তোমার নেই মিনতি ?'

'না।'

'তবে আমার জেল হবে শুনলে অমন কেঁপে কেঁপে ওঠ কেন ?'

'তোমায় দেখতে পাব না বলে। কিন্তু আমার সে—ভয় ভেঙ্গে গেছে। কারাগারের সাধ্য কি আমার মন থেকে তোমায় আড়াল করে নেয়। যাও তুমি জেলে।'

'এই তো দেশ সেবকের স্ত্রীর মত কথা! আমায় হাসি মুখে বিদায় দেবে কথা দাও।'

'দিলাম,' মিনতি হাসিল যেন।

এর দিন কয়েক পরে অজয়ের জেল হয়। সংবাদ শুনিয়া সেদিন কি মিনতির মুখে হাসি ছিল? সত্যই সে কি একটুও বিচলিত হয় নাই? সত্যই কি দেশ সেবকের স্ত্রী হওয়ার গর্ব সেদিন তাহার বুকের ভিতর ঠেলিয়া উঠিয়াছিল? কে জানে! মাঝে মাঝে অজয়ের সন্দেহ হয়। হয়তো মিনতি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মুখে যাহাই বলুক, সে একেবারে ছেলেমানুষ। হয়তো নিজকে সামলানো সেদিন তাহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

এমন অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে অজয় পথ চলিতে লাগিল। বহুদিন পর সে আবার দেখিবে প্রত্যেককে—মা বাবা

আর মিনতিকে। কিন্তু কোথায় তাহার উৎসাহ! কাহাকেও দেখিবার ক্ষীণতম ইচ্ছাও অজয়ের নাই। কারাকক্ষের এই কয়েকটা শুষ্ক বছর অন্তরের অবশিষ্ট কোমলতাটুকু নিঃশেষে শেষ করিয়া দিয়া তাহাকেও যেন শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। বাস্তবের প্রচুর প্রহারে পঙ্গু অজয় আজ। চারধারে গর্ভবতী অন্ধকার আর শ্রান্ত পদক্ষেপ অজয়ের!

* * *

নিজের বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে অজয়ের বেশ কিছু দেরীই হইল বলিতে হইবে। সামনে পিছনে চারপাশে অসংখ্য বাড়ী উঠিয়া তাহাদের ছোট আস্তানাটিকে একেবারে আড়াল করিয়া দিয়াছে। কী পরিবর্তনই যে হইয়াছে! কত অদল বদল!!

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বাবা বোধ হয় বসিয়া আছেন। অজয়কে দেখিয়া কি করিবে সকলে! সে কড়া নাড়িল।

'কে?' যোগেনবাবুর কণ্ঠস্বর।

'আমি অজয়।'

'ও,' অজয়ের মুক্তির সংবাদ যোগেনবাবু যথাসময়ে পাইয়াছিলেন। দরজা খুলিয়া তিনি বলিলেন, 'আয়।'

'একি।' অজয় হতভম্ব হইয়া গেল, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

যোগেনবাবু হাসিলেন শুধু। সে-যোগেনবাবু আর নাই।

চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে তাহার। অসম্ভব রোগা হইয়া একে-বারে অন্য মানুষ হইয়া গেছেন যেন। অজয়কে দেখিয়া তিনি লাফাইয়াও উঠিলেন না কিংবা আনন্দে চীৎকারও করিলেন না। অজয় বিস্মিত হইল। কক্ষের চারপাশে দারিদ্রের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আস্তে আস্তে সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

মা একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিলেন। অজয়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। রাজবালাকে দেখিয়া অজয় চমকাইয়া উঠিল, তিনি একেবারে বুড়ী হইয়া গেছেন। গাল গেছে তুবড়াইয়া, মুখে নামিয়াছে বার্দ্ধক্যের ছায়া।

'বস্,' খুব আস্তে আস্তে রাজবালা বলিল।

অজয় বসিয়া পড়িল।

'কিছু খাবি অজয়?'

'হ্যাঁ, মুখ ধুয়ে একেবারে ভাত খেয়ে নেব।'

'বেশ, বউমা সব ঠিক করে রেখেছে।' তোর চেহারা বড় বিশ্রী হয়েছে। চেনা যায় না।'

চুপ চাপ।

অজয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সে কি এ বাড়ীতে নূতন আসিল না কি?

কোথায় তাহার সেই মা? সেই বাবা? তাহারা যেন সরিয়া গেছে অনেক——অনেক দূরে। এরা সব নূতন মানুষ।

সেই মা বাবার নাগাল আর কোনদিনও কি অজয় পাইবে! যে—মা অজয়ের সহিত বকিতে পাইলে আর কিছু চাহিতেন না আজ কি তাহার সমস্ত কথা ফুরাইয়া গেল এর এর মধ্যে ! অজয় কি তাহাদের সেই ছেলে নয় ? কেন এমন হয় ! কেন তাহারা সরিয়া গেল অনেক দূরে ! দীর্ঘ বছরগুলি নিঃশব্দে কাজ করিয়া গেছে। অজয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

অজয় বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া আর সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া মিনতি আসিল অবশেষে। স্বামী স্ত্রীর দেখা হইল আবার অনেকদিন পর।

'কেমন আছ ?' অজয়ের পাশে বসিয়া মিনতি জিজ্ঞাসা করিল!

'ভাল আছি মিনতি,' অজয় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। সে-মিনতি আর নাই। তাহার উপর মিনতির মুখে আসিয়াছে গাম্ভীর্য। সে যেন হাসিতে ভুলিয়া গেছে।

'আচ্ছা,' অজয় বলিল, 'তোমরা সব এমন হয়ে গেছ কেন ?'

'কেন ?'

'তোমরা কেউই যেন আর আগের মানুষ নেই।'

'আর তুমি ?'

'আমি কি ?'

'তুমিও কি আর আগের মানুষ আছ নাকি ?'

'তাই নাকি ?'

সত্যিই তাই। অজয় একবার নিজের কথা ভাবিয়া দেখিল। বছর কয়েক আগের অজয় সেও তো আর নাই। তাহারও যে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কোথায় তাহার সেই শক্তি? সেই উৎসাহ? সেই প্রেরণা? স্ত্রীকেও অবাধে কাছে টানিতে ভরসা হয় না আর। ইচ্ছাও করে না। একটা অশুভ ছায়া অকস্মাৎ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই পুরাণো অজয়কে এই অজয় আর আজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। সে-অজয় আজ চলিয়া গেছে দূরে—বহু দূরে। সরিয়া গেছে একেবারে।

'কেমন ছিলে মিনতি?'

'এক রকম, তুমি?'

'বেশ।'

কথা বলিয়া ঠিক তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে না। দুই জনের যেন এই প্রথমবার দেখা হইল। আবার নূতন করিয়া আলাপ করিতে হইবে। কয়েকটা বছর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নির্মান করিয়াছে কঠিন প্রাচীর।

খোলা জানলা দিয়া অজয় বাহিরে চাহিল। সেই সব পুরাণো পথ, সেই পরিচিত চারধার আজ এই অতীর অন্ধকারে বড় বিচিত্র লাগিতেছে—বড় অপরিচিত। কী পরিবর্তনই যে হইয়াছে এই দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে!......

মিশরের মমি

(উৎসর্গ—বুদ্ধদেব বসুকে)

ফাল্গুনী রায়

রাত্রি—১২টা

ভাদ্র, ১৩৪৭

মিশরের মমি

আর একটা বাঁক নিতেই দুর্ঘটনা। নিখিল হঠাৎ, আচমকা দেখলো—ওই একটু দূরে নীলিমাকে—আশ্চর্য! নিখিল বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে ডাকলে: নীলিমা!

—আরে নিখিলদা, তুমি কোথার থেকে?

—আপাততঃ প্রেসের থেকে, তুমি?

—শেয়ালদা ষ্টেসান থেকে, তারপর, কত দিন পরে বলতো, কী করছ আজকাল? চেহারা অত বিশ্রী হয়ে গেছে কেন?

—চেহারা! নিখিল ম্লান একটু হাসে, একটা লম্বা শ্বাস ঝরলো।

—চেহারার কী থাকবে বল? দিন রাতই তো পেষিত হ'চ্ছি, I am pressed totally in that tiny press, শুধু প্রেসেই কেন? চার দিক থেকে।

ভীড় ভীষণ। কোনো একটা ছুটির উপলক্ষ বোধ হয়। কানে বাজে কত কল-কোলাহল।

ও কী এগিয়ে যাচ্ছে। নীলিমা ক্ষণে ক্ষণে দেখছে নিখিলকে। বাস্তবিক নিখিল কী হ'য়েছে। সেই নিখিল, কবি নিখিল, অফুরন্ত প্রাণ-চঞ্চল নিখিল, সেই স্বপ্ন-বিলাসী নিখিল!

হ্যাঁ, নিখিল একদিন কবিতা লিখতো। স্বপ্নই ছিল পসরা। আর তার কবিতা গুলো ছিল ভারী চমৎকার, তার প্রাণের মতই গান-ময়। রেশমী কথাগুলো সে যখন—সাজাতো ছন্দের দোলনে যেন ঘুম-পাড়ানী গান। নিখিলের এক মাত্র সাধ ছিল কবি হওয়ার—বড় কবি হওয়ার, আর কিছু না।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত স্তব্ধতা। যেন মাঝ রাতে মাঝ পথে মরা মাঠের মাঝে ট্রেন থেমে গেল।

নীলিমাই জের টানে: চুপ চাপ যে কী ভাবছ!

—ভাবছি? এই নিজের জীবনের কথা, বাস্তবিক what a change! যাক, শুধু নিজের কথাই তো বলে চলেছি তোমার কিছু জানা যাক। কেমন আছ? তোমার চেহারাও তো ভয়ানক খারাপ হ'য়েছে!

নীলিমাও ক্লান্ত হাসি হাসে। বলে: আমার অবস্থা যা, কিছুই হ'লো না। বাবা মারা গেলেন, মা তো বহু দিনই, সুতরাং এখন যা করবার—স্কুল মিস্‌ট্রেস!

—স্কুল মিস্‌ট্রেস—that old life, উঃ school Mistress. এর মত life বোধ হয় নেই, না নীলিমা!

—হ্যাঁ, ঠিক তাই, আচ্ছা আমরা দুজনে কবিতা লিখতাম একসঙ্গে মনে আছে, আমাদের হাতের সম্মুখে, ওঃ what a wonderous life, সেই সন্ধ্যের নিরালা নীল তারা।

নীলিমার যেন একটু উচ্ছ্বাস আসে। বাস্তবের ভাবে নীলিমার কথা। বাস্তবিক তারও কী হ'য়েছে। বাস্তবের রুদ্র থাবার চাপে তারও কী হ'য়েছে। একেবারে সব টুকু নিঃস্ব-নিঃশেষ করে দিয়েছে—সব টুকু কুরে-কুরে দিয়েছে। নিখিলের মনে পড়ে ওদের সেই স্বর্গিয় স্বপ্নময় জীবনের কথা।

মিউজিয়মে—তারা যে মিউজিয়মে আছে একেবারে ভুলে গিয়েছিল।

নিখিল বলছে: কোথায় আছ ?

—ঢাকায়, এখানে এসেছি একটু কাজে, নিজের ভাবনা স্কুলেরই।

ওঃ, তারপর কবিতা এখনো লেখ নাকি ?

—তুমি একথা বলতে পারলে ? আশ্চর্য ! কবিতা, নিখিলদা, কবিতার অপমৃত্যু হ'য়েছে বহু দিন !

তারপর একটু থেমে বল্লো: তুমি লেখ ? সত্যি কী melody ছিল তোমার কবিতার ! আমরা সব বলতাম, you will be the great poet. তোমার কবিতা যে পড়তো, আর ভুলতোনা—what a charm. তোমার সেই 'সোনার ঝরনা-তলে,' 'রাতের কবিতা,' those are gems. বাংলা সাহিত্যে ওরকম Romantic 'কবিতা পড়িনি।

নিখিলের এসব শুনে কান্না আসতে লাগলো—বড় ব্যথা

বাজলো। কান্নার প্রবল এক তরঙ্গ যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে। নিখিল সামলে নিলে। বল্লেঃ কবিতা? বল্লাম তো প্রেস আমার সব টুকু নিয়েছে—that roar of dragon। ছাপাখানার বর্বর ঘর্ঘর শব্দে ময়ূরের ডাক শোনা যায় না, নীলিমা শোনা যায় না।

নীলিমার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি। নিখিল বল্লেঃ এসো একটু বসা যাক ভীষণ tired, বড্ড ক্লান্ত।

একটা বেঞ্চি ছিল সামনেই। ওরা বসলো। নীখিল বলছেঃ আজকে প্রেসের সেই বড় বাবুর সঙ্গে এক ঝাপটা হ'য়ে গেল।

—কী?

নীলিমার জিজ্ঞাসা।

—ভয়ানক কাজ পড়েছে, একটু দেরী হ'য়েছ তাতেই অত।

—তাই নাকি? like a demon, না?

—ঠিক তাই নীলিমা। বহু দিনই হ'য়েছে। একেতো পাতাল-ঘর আলো নেই, বাতাস নেই, মন ঠিক থাকেনা, তাতে আবার তাদের হুঙ্কার, নীলিমা, it is unbearable?

—তবু তো করতেই হ'বে!

—হ্যাঁ মৃত্যু অবধি, নীলিমা আমার সব চেয়ে কষ্ট হয় আমার কবিতা নষ্ট হ'লো—আমার একান্ত পরম সাধনা, সেই টাই সব চেয়ে দুঃখ।

—তাই আমারও নীখিলদা। আমাদের দুজনের কী সব স্বপ্ন ছিল, now the Robin has turned into a vulture, that's the greatest tragedy! কবিতার খাতা কোথায় আর পরীক্ষার খাতা কোথায়? নিখিলদা, তুমি জানো না, কী troublesome হচ্ছে এই পরীক্ষার খাতা দেখা, রাত জেগে জেগে এক মরু পরীক্ষার খাতা দেখা, কী বিশ্রী, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ। নীলিমা আবার আরম্ভ করলেঃ জানো নিখিলদা, সব চেয়ে মজার কথা বাইরে যখন বর্ষা, সেই বর্ষা, যা চিরকাল কবিতার রাজ-ঋতু; তখন আমাদের দেখতে হয় পরীক্ষার খাতার বর্ষা সম্বন্ধে Essay; "ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষা অন্যতম। এই সময়ে ভালো তাল শাঁস, জাম, আম ইত্যাদি পাওয়া যায়।" হাসির কথা কিন্তু কী কষ্টের, বলতো! এই রকম বহু funny খাতা, নিখিলদা তাই বলছি, কোথায় পরীক্ষার খাতা আর কোথায় কবিতার খাতা!

নিখিল একটু হাসে। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ—আরও মর্ম্মান্তিক।

নিখিল বললেঃ সত্যি, সেই সব দিন! একবার শিলচর এ গিয়েছিলাম আমরা—সেই বড় পাইন বন—ঝরনা, সেই কবিতা মনে আছে লিখেছিলামঃ 'হাওয়ারা বাজায় পাইনের বনে

পিয়ানো, ঝরনার ঝড়ে মর্ মর্ করে বন।' 'ঝাউ-ঝাড়ে-ঝাড়ে ঝিঁঝিদের ঝন ঝক্,'—কী সব lyrical দিন গেছে, we were two only in the lonely pine grove. সেই 'ঘাস শীষে শীষে শিশিরের শিস্ শুনেছ ?' নিখিল তার নিজের কবিতার কয়েকটি অসংলগ্ন লাইন উচ্চারণ করে গেল। 'মনে আছে নীলিমা একদিন লিখেছিলাম ঃ

চুপ চাপ একা জানালায় কেন।
নীলিমা ?
কাজ কী এসব উদাসীনতায় ?
এসো না।
নীল দুধে-ধোওয়া ধবধবে সাদা রাত,
রাস্তাটা যেন ঝক্ ঝকে ইস্পাত !
এই হাতে রাখো রাঙা ভেলভেট—হাত
রাখো গো !'

'কী সব দিন গেছে স্বপ্ন-রঙীন্। নীলিমা, আর আজকে ? হাসি পায় নীলিমা, হাসি পায় !'

—সত্যিই নিখিলদা What a dramatic change, বাস্তবিক জীবনে নাটকের স্থান সত্যিই আছে ? না ? There is drama in our life, আর এই রকম drama, এই রকম tragedy কী আশ্চর্য !

নীলিমা বললো। গভীর ব্যথা-ভরা তার সুর। নিখিল বল্লে ঃ আচ্ছা তোমার সেই কবিতার খাতা কী হ'লো ?

—কোথায় হারিয়ে গেছে, বাস্তবের ভীড়, তার কী খোঁজ পাওয়া যায় ? বলেছিই তো নিখিলদা কবিতার 'পোষ্টমরটেম' হ'য়েছে অনেক দিন। তোমার গুলো ?

—আমার ? বহু দিনই, তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম।

দুজনে এতক্ষণ বসেছিল—আর কেউ না। কয়েকজন লোক এসে আবার বসে, সুতরাং ওদের উঠতে হ'লো। নিখিল বল্লে ঃ 'চলো, ওঠা যাক, একটু ওই দিকে যাওয়া যাক।' উঠলো। আস্তে আস্তে ওরা চলতে লাগলো। ওদের ক্লান্ত ক্লিষ্ট করুণ পদক্ষেপ—বেদনা-বিবর্ণ পদক্ষেপ—পদে পদে পলে পলে পিষ্ট প্রাণহীন পুতুলের পদক্ষেপ। নিখিল বল্লে ঃ আজ ভীষণ ভীড়, কেন বল তো ?

—কী জানি, কোনো পরব হ'বে বোধ হয়। আচ্ছা, নীলিমা আবার পূর্ব কথারই সুর টানে, ওরকম কী বকছিলে আপন মনে ?

— কখন ?

—ওই Fossilsএর ঘরটায়, আমিতো চিনতেই পারিনি !

—না পারাটা কী আশ্চর্য ! আমাকে এখন কে চিনতে পারে ? কেউ না। তোমাকেও আমি চিনতে পারিনি

আমাদের এখন কেউ চিনতে পারবে না, we are different creatures, we are in dead land !

*   *   *

অতর্কিতে ওরা আর একটা ঘরে এসে পড়লো। নীলিমা বল্ল : আমাদের তুজনেরই এখন সমান অবস্থা, অতীতের ভগ্ন স্তুপে রয়েছি।

—হ্যাঁ নীলিমা আমাদের dreamy অতীতের উপর কবর চাপা দিয়েছি। We are scratched, we are smashed, we are crushed.

এই ঘরটা প্রশান্ত। মৃত্যুর অতল প্রশান্ত ছমছম করে এই ঘরটায়। তাই ওদের কথা গুলো বাজতে থাকে। এই ঘরটা ভীষণ ভীড়ে ভরা, কেননা এই ঘরটায় নাকি Mummy থাকে, মিশরের মমি।

সেই কাঁচের বাক্সের কাছে ওরা এলো। ওরা দেখছে চার হাজার বছরের একটি মৃতদেহের মমি। পাশেই তার আসল সুন্দর ছবি। ওরা দেখছে—মমি, কী বিকট মূর্ত্তি, ধ্বংস-বিকৃত মূর্ত্তি—মাংস নেই, মুখটা যেন হাড়ের বীভৎস তুঃস্বপ্ন—কী ভয়াল, কী ভীষণ !

নিখিলের কাছে সব পৃথিবী যেন ঘুলিয়ে আসছে,—সব মুছে আসছে,—সব ঘুচে আসছে—সব মরে—সব ঝরে আসছে।

নীলিমার চোখের সব আলো যেন নিভে আসছে, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ডুবে যাচ্ছে, এই লোকজন, এই পৃথিবী যেন একটা বুদবুদের মত বিদ্যুৎময় মহাশূন্যে-মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিখিলের মনে হ'চ্ছে কে যেন তার শ্বাস রোধ করে দিচ্ছে। তার কথা কইবার শক্তি নেই, তবুও একবার আতঙ্কময়, বিরাট আর্ত্তনাদ করে উঠলো: নীলিমা, কোথায় তুমি? আর সেই মুহূর্তে, কী আশ্চর্য, নীলিমাও মহা চীৎকার করে উঠলো। তার কণ্ঠ যেন সহস্রটা হয়ে গেল। সমস্ত ঘরের ঘুমন্ত ঘন প্রশান্তি নিমেষে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

—নিখিলদা, নিখিলদা, কোথায় তুমি? কী হয়েছে, ও রকম করছ কেন? নিখিলের ভীতিময় গলা।

—ওঃ তুমি এখানে, নীলিমা নিখিলের হাত দুটি চেপে ধরলো যেন নিবিড় অবলম্বন করে। তারপর আশঙ্কা-দূরিত আশ্বস্ত কণ্ঠে বল্লে: কী আশ্চর্য, তুমি এখানে, আমি ভেবেছিলাম।.........

নীলিমার চোখ দুটো আবার ভয়ে, আতঙ্কে, বিশাল হ'য়ে উঠলো, থর থর করে উঠলো ওর শরীর। পূর্বস্মৃতি আবার রোমাঞ্চ এনে দিচ্ছে।

পাশের লোকজন যারা ছিল তারা আশ্চর্য হ'য়ে দেখতে লাগলো এদের অদ্ভূত কাণ্ড।

কী ভেবেছিলে, নীলিমা।

নিখিলের জিজ্ঞাসা।

—আমি ভেবেছিলাম তুমি আস্তে, আস্তে, মমি হ'য়ে আসছ, ওই ধ্বংস বীভৎস মমি, আর ওই কাঁচের ঘরটায় যে মূর্ত্তি সে যেন তুমিই······

নীলিমা একবার নিখিলের পানে আর একবার ওই ভয়াল মমির দিকে চাইল।

নিখিলের গভীরতম বিস্ময়। আমিও তাই ভাবছিলাম, তাইতো চীৎকার করে উঠলাম—উঃ চলো নীলিমা এ ঘরটা থেকে শীগগির পালাই—এখানে যেন আমাদের আসল প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাই—চলো, নীলিমা, চলো, আর এক মুহূর্ত ও না, উঃ How horrible'······।

সকাল থেকে সন্ধ্যা

(উৎসর্গ—ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে)

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাত সাড়ে দশটার পর

রবিবার

৬ই আশ্বিন, ১৩৪৭

সকাল থেকে সন্ধ্যা

ঘড়ি ঘোষণা করল সকাল ছটা।

দেখলেই বোঝা যায় কোন দিন সুন্দর ছিল। প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ী। পায়রার খোপের মত অসংখ খোপ। নানা জাতের ভাড়াটে। বহু বর্ষ প্রহার করেছে একে। আজ ওর শরীরে উগ্র কাঠিন্য। কী বীভৎস ইটগুলি! দারুণ দারিদ্রে ভয়াবহ কঙ্কালে পরিণত যেন। তবু কোনদিন বাড়ীটা সুন্দর ছিল।

এই বৃদ্ধ বাড়ীর তেতালার কোন সংকীর্ণ কক্ষে দেখা গেল মশারী তখনো ফেলা। দুটি ছোট মেয়ে হালুয়ার প্লেট নিয়ে মাটিতে বসেছে। তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অলকের ঘুম ভাঙলো।

এই পিপি, জিজি, জিজি, পিপি অলক আলস্য দূর করে ওঠবার চেষ্টা করল।

বাবা তুমি এখনও ওঠনি? জিজি হাসল, মা বকবে ওঠ।—

ওত বাবা ওত, ছোট মেয়ে পিপি ভাল করে কথা বলতে পারে না।

শরত-সকালের স্তিমিত রোদ সে-সংকীর্ণ কক্ষেও আছড়ে পড়েছে। আলস্যময় আবহাওয়া চারদিকে। অলকের পক্ষে শয্যা ত্যাগ করা সুকঠিন হল। ও পাশ ফিরল। চোখ তার

জড়িয়ে আসছে। আরেকবার ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। দুরন্ত সাইক্লোনের মতো অকস্মাৎ মানসী প্রবেশ করে রসভঙ্গ করল।

কী আশ্চর্য! এখনও তোমার ঘুম ভাঙলো না—

চোখ মেলতেই এ কী মূর্তি তোমার!

থামো, থামো, আর রসিকতা করতে হবে না। বাজার যাবে কখন? ঘড়িটা দেখ তো একবার।—

নিয়ে এস তো ওটা, চুরমার করে ফেলি।

থাক, আর বাহাদুরী করতে হবে না। তাহলে নতুন ঘড়ি কেনবার জন্যে আরেকটা প্রাইভেট ট্যুশানি জোগার করতে হবে। নাও অনেক হয়েছে, এবার ওঠ।

মানসীর কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে নয়। সুতরাং ঘড়ি ভাঙার ইচ্ছে আপাতত অলককে স্থগিত রাখতে হল। ঘড়ি চুরমার করলেও অলকের ইচ্ছে মত ঘুমনো চলবে না। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব হাতছানি দেয়। সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। বাঁচতে হবে। এই জীর্ণ, দীর্ণ, শীর্ণ, পঙ্গু পৃথিবীতে অন্ন আহরণ করে টিকে থাকতে হবে।

কেউ শুনবে না নালিশ। অলককে অবশেষে উঠতেই হল।

মিনিট কয়েক পর পট পরিবর্তন। ছাই দিয়ে দাঁত মাজা শেষ করে ভাঙা পেয়ালা হাতে নিয়ে অলক বসল চা খেতে।

সামনে ওর খোলা অমৃতবাজার এক খানা। পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না এটা। তাহলে হয়তো পড়া সম্ভব হত না। পাশের ঘরের নানকু বাবু লোক ভালো। তারই দয়ায় পত্রিকা খানা এরা পড়তে পায়।

জার্মানীর খবর শুনেছ মানসী এই দেখ——

রাখো তোমার জার্মানীর খবর। আজ দেখছি ভাত না খেয়েই ইস্কুলে ছুটতে হবে। সাতটা বেজে গেছে—

What? অলক এক চুমুকে বাকী চা টুকু শেষ করে দিল। এক ঠেলায় উড়িয়ে দিল জার্মান সৈন্যদের তিন হাত দূরে। এই মুহূর্তে বাজারে না ছুটলে উপায় নেই।—উপোস করে অফিস করতে হবে তাহলে।

এদিকে মানসীর ও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রায়। মেয়ে ছুটোর কাপড় কেচে, দুধ গরম করে, ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ও মহা মুস্কিলে পড়ল। অর্থাৎ উনুন খালি যাচ্ছে।

যায় যাক্।—একটু বিরক্ত হল যেন মানসী। মেয়েছুটো হঠাৎ এসময়ে আবার তারস্বরে কান্না আরম্ভ করল কেন বোঝা কঠিন। দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ও এল ওদের চোখ রাঙানি দিতে। আশ্চর্য! মানসীকে দেখেই পিপি আর জিজির মুখের ভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্তিত হল। কে বলবে ওরা কাঁদছিল! মুচকি হেসে মানসী ঘর পরিস্কার করতে আরম্ভ করল।

অলক যখন ফিরল তখন ঘড়িতে প্রায় আটটা। মানসী মুহূর্তে বাজারের থলি নিয়ে উধাও হল। স্বামী-স্ত্রীর এখন আর কথা বলবার সময় নেই। অলক আরম্ভ করল দাড়ি কামাতে। আফিসের কয়েকটা কাজ বাকি আছে। স্নান সেরে সেগুলো সারতে হবে। সময় সংক্ষেপ। তার ওপর আজ কদিন ধরে দেরী হচ্ছে অফিসে। অলককে তাই বাধ্য হয়ে সকাল বেলা ছেলে পড়ানো ছাড়তে হয়েছে।

বাবা, বাবা, আমি ওই সাবান মাখব, জিজি বলে।

তুমি কাল মাখবে, আমি আজ মাখি, য়্যাঁ ? অলক হাসে। ছোট মেয়েটা হাঁটতে পারে না। কোন রকমে অলকের পায়ের কাছে এসে হাজির হয়।

কিরে ? তুই কী চাস্ ? পিপি উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে করে না। হালুয়ার শূন্য ডিস্‌টা বারকয়েক মাটিতে আছড়ে দেয়। ঘড়ির কাঁটা দুটো ঘুরতে থাকে। বিরতি বিহীন।

দৃশ্য বদলালো।

দেখা গেল অলক আর মানসী আহারে ব্যস্ত। জিজিও বসেছে একটা প্লেট নিয়ে। পিপিকে মানসী একটু আগে গরম দুধ খাইয়ে দিয়েছে। এখন ও বিছানায় শুয়ে। চোখের পাতা না বুজলেই মায়ের প্রহার। স্বামী-স্ত্রীর যে কথাগুলো বিনিময় হল খেতে খেতে সেগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সংসার

সম্বন্ধে। সুতরাং এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। দশটা বাজল।

খাওয়া শেষ হল। প্লেট পরিস্কার আরম্ভ করল মানসী। ক্ষিপ্র হাত তার। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় হয়ে এল প্রায়। অলক অফিসের পোষাক পরে প্রস্তুত হতে লাগল।

ধোপাটা আসছে না, ভয়ানক ব্যস্ত মানসী, কী পরে যাই ইস্কুলে ? অলক নীরব। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। সময় নেই ওর এসব কথায় কান দেবার। জিজি কী একটা কথা বলতে এসে প্রচণ্ড চড় খেল মার কাছে থেকে।

ঘড়িটা কী আজ দ্বিগুণ জোরে চলছে ! সাড়ে দশটা। অলক বেরিয়ে গেল। মানসীও প্রস্তুত। জিজিকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা দিয়ে ঝড়ের মত ও বেরিয়ে গেল। ঘড়ি নির্বিকার।

এরপর দুপুর। একজন ইস্কুলের টিচার আর একজন কেরাণী। দুজনের কর্মস্থলের ব্যবধান অনেক মাইলের। কাজেই অনেকক্ষণের ছেদ।

এইতো ওদের সংসার। তবু অচল যেন। খরচ বেশী কিন্তু আয় কম। আবার দুটো ছেলেমেয়ে ! মুস্কিল ! দু'জনের উপার্জিত অর্থে ওরা খুসী নয়। আরও প্রয়োজন। তাই অলক সন্ধ্যেবেলা ছেলে পড়ায়। আর কোন ছাত্রী যাকে

স্বয়ং তানসেনও গান শেখাতে অক্ষম তার সঙ্গে মানসী ওই সময় সঙ্গীত চর্চা করে। ইচ্ছে না থাকলেও উপায় নেই। পয়সার প্রয়োজন। বাঁচতে হবে—এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে হবে।

অপরাহ্নের আরম্ভে ওরা ফিরে এল। আগে এল মানসী। অনেক কাজ ওর এখন। বিশ্রামের কথা ভাববারও অবসর নেই। তালা খুলে প্রথমে ও হাতের বই খাতা ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের ওপর। মেয়ে তুটো জাগেনি এখনো। যাক বাঁচা গেল। মানসী হাই তুললো বার কয়েক। ক্লান্ত লাগছে বড়ো। শান্ত পদক্ষেপে উনুনে আগুন দিতে গেল ও। চায়ের জল চাপিয়ে দেয়া যাক্, অলকের আসবার সময় হল। মেয়ে তুটোকে একটু পরে জাগিয়ে সাজালো মানসী। রান্না চাপানো হয়ে গেছে। কী অমানুষিক পরিশ্রম! যন্ত্রের মতো মানসী আজ। কে নিয়ে যাবে মেয়ে তুটোকে বেড়াতে! গা ধুয়ে প্রসাধনের পর মানসী প্রতীক্ষা করতে লাগলো অলকের। এখন ওর মুহূর্তের অবসর। গা এলিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে তাই বিছানায়। কিছুই ভাল লাগে না। জীবন হয়ে উঠেছে তিক্ত বিষাক্ত। হাওয়া যেন বন্ধ হয়ে গেছে। তবু বাঁচতে হবে।

ঘুমলে নাকি মানসী! অলকের প্রবেশ।

মানসী উঠে বসল, না তোমারই অপেক্ষা করছি।

পোষাক বদল করতে বেশী দেরী হল না অলকের। প্রত্যহ এই সময় ও স্নানটা সেরে নেয়। খুব অল্প সময়ে যদিও। তারপর অবসর। মানসীকে আবার বেরুতে হবে ছটা পনের মিনিটে গান শেখাতে। অলকও প্রায় ওই সময় যায় ছাত্র পড়াতে।

এসো মানসী, এই ঘরেই আজ এক সঙ্গে চা খাই।

বেশ তো, মানসী উঠে যায় সরঞ্জাম আনতে।

পরের দৃশ্য।

সেই সংকীর্ণ কক্ষ। অলক, মানসী আর জিজি, পিপি। চা পান চলছে। সঙ্গে বিস্কুট আর রুটি। শরতের অপরূপ অপরাহ্ন। কিসের সূচনা হাওয়ায়! শরত এসেছে আকাশে বাতাসে, গ্রামে, সহরে, পৃথিবীতে, এমন কী এই তেতালার সসীম সংকীর্ণ ঘুণ ধরা গণ্ডিতে। এটা কী বিদ্রূপ! এদেরও গায়ে লাগলো শরতের সজীব স্পর্শ! কী আশ্চর্য!

মানসী, অলক আরম্ভ করলো, একদিনের কথা তোমার মনে আছে?

কোন কথা?

যে-দিন কলেজ পালিয়ে রেষ্টুরেণ্টে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম? সেটাও শরত। পূজোর ছুটির ঠিক আগের দিন। মনে আছে?

হ্যাঁ, মানসী হাসলো।

আর আজ?

আজ এই ভাঙা পেয়ালা, মানসী দেখালো।

কেন এমন হল? কী করুণ! কী সাংঘাতিক পরিবর্তন!!

মানসীর মুখে কথা নেই।

আজ কেবলই আমার সেই সব কথা মনে পড়ছে মানসী। সেই টেনিস ম্যাচ, সেই সাঁতার, অতীতের সেই সমৃদ্ধ জীবন। কী ছিলাম আমরা!

র‍্যাকেট হাতে তুমি যখন দাঁড়াতে কে বুঝতো তুমি বাঙালী। লম্বা, ফর্সা—আশ্চর্য মেয়ে তুমি মানসী—

আর তুমি? মানসী চায়ের কাপ নামালো, আমরা দুজনে ছিলাম কলেজের গৌরব। প্রফেসার ঘোষের সঙ্গে সেই তর্ক মনে আছে?

খুব মনে আছে। কিন্তু কোথায় মিলালো আজ সে দিন গুলি। We are in dreamland…দারুণ Romantic ছিলাম আমরা!

মানসী হাসলো, তোমার প্রেম নিবেদনের কথা ভাবলে আমার হাসি পায়। হঠাৎ এসে আমায় বললে, Manashi, I shall make you queen, মনে পড়ে?

পষ্ট। নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলাম আমরা। বিদ্রোহের আগুন ছিল আমাদের শিরায় শিরায়। অলক মুখোপাধ্যায় আর মানসী মিত্রের লভ্ ম্যারেজ—কী হৈ হৈ সেদিন—

বিদ্রোহের সে-আগুনের ছাইও আজ অবশিষ্ট নেই, মানসী নিশ্বাস ফেললো, আজ শুধু আছে sigh—

যা বলেছ। কোন লেখক লিখেছে জীবন আর মিথ্যা এ দুই এর সম্বন্ধ অতি নিকট। বলতো lie,—

lie, মানসী উচ্চারণ করলো।

এবার বল life—

Life.

দেখছ, অলক হাসলো, Life is just a long drawn out lie with a sniffling sigh at the end.

সত্যি, কথাটা খুব ঠিক।

কত কল্পনা করেছিলাম আমরা—কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, অলকের কণ্ঠ বাধা মানে না, কিন্তু এ কী হল আমাদের? সেই ড্রাইভটা কিন্তু আমাদের চমৎকার হয়েছিল!

কোনটা বলতো?

সেই রেবতী মুখার্জির গাড়ীতে?

ওঃ, আজও ভুলতে পারিনা।

আচ্ছা মানসী এখন তুমি টেনিস্ খেলতে পারো?

দূর পাগল! সময় কোথায়? ইচ্ছেও করে না আর।

আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ানক খেলতে ইচ্ছা করে।

চলো মানসী এ সহর ছেড়ে আমরা পালিয়ে যাই, চলো আবার ফিরিয়ে আনি সেই জীবনকে—এ অসহ্য।

তোমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়েছে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ।

আজ শরতের মন্থর অপরূপ অপরাহ্ন মুহূর্তের জন্য বুঝি ওদের হৃদয়ের ধারে ধারে রঙ ধরালো। সে-রস-রঙীন দিনগুলি এই পঙ্গু প্রহারিত জীবনে ক্ষণে ক্ষণে দিল প্রচুর প্রলেপ। জীবন-সমৃদ্ধ অতীত অন্তরের দ্বারে বহন করে আনলো আজ বিগত হাজার চন্দ্রিল মুহূর্তের ইঙ্গিত। আবেশে ওরা অবশ হল।

এ কী! অকস্মাৎ মানসী লাফিয়ে উঠল, ছটা বাজে অথচ আমার চা খাওয়াই শেষ হল না। তোমার জ্বালায় আর পারা গেল না। গান শেখানোর চাকরীটা গেল আমার এবারে—মানসীর দ্রুত প্রস্থান।

অলক ঘড়িটার দিকে চাইল একবার করুণ চোখে। কিন্তু

এত সময় হল কী করে এর মধ্যে! সাধে কী আর ও ঘড়িটাকে চুরমার করে ফেলতে চেয়েছিল! টং টং শব্দ করে ওটা ওদের বিগত বিচিত্র জীবনের ওপর ফেলল কালো যবনিকা।

ঘড়ি ঘোষণা করল—সন্ধ্যা ছ'টা।